অক্টো-নভেঃ 1986

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

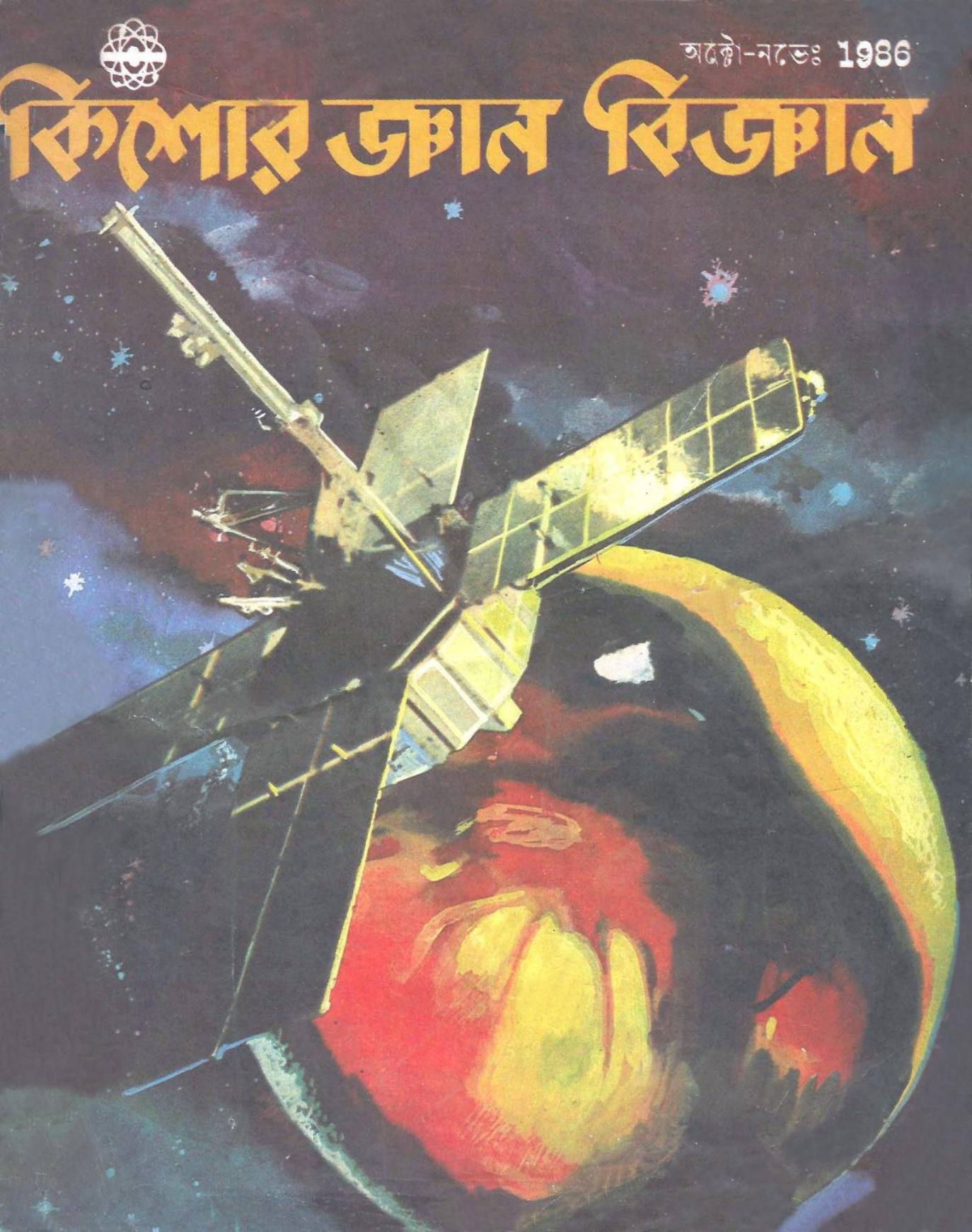

ফ্যান্টাসী ও মজার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদা ও মৌ-কা-সা-বি-স** ১৫৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **চারমূর্তি** ১০৲
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ **রামধনু** ১০৲
উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী
গুপীগাইন বাঘাবাইন ৫৲
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **ঘনাদার জুড়ি নেই** ১০৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **কম্বল নিরুদ্দেশ** ৮৲
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের মজার গল্প ১০৲
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ **মঙ্গলগ্রহে ঘনাদা** ১০৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **ঝাউবাংলোর রহস্য** ৭
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ছোটদের শ্রেষ্ঠ গল্প ১০৲

ঘনাদা কাহিনীর নতুন চমক !

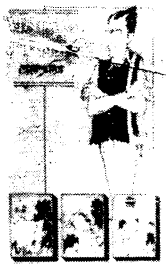

মৌলিক কাহিনী সার বিপণন সংস্থা ঘনাদাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে— গল্পের প্লট সাপ্লাই করবে ঘনাদা কিভাবে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করবেন ?

প্রেমেন্দ্র মিত্র

ঘনাদা ও মৌকাসাবিস ১৫৲

জীবনচরিতমালা

জাতীয় জীবনীকার মণি বাগচি
প্রণীত জীবন চরিতমালা
প্রতি খণ্ড দশ টাকা

আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র ॥ পরমাণু বিজ্ঞানী ভাবা
আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ ॥ কৃতী বিজ্ঞানী
মেঘনাদ ॥ বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র
কৃতী বিজ্ঞানী সি· ভি· রমন
মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইন
যুগদেবতা রামকৃষ্ণ
পরমাপ্রকৃতি সারদামনি
বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ
আলোকময়ী শ্রীমা

রহস্য রোমাঞ্চ ভৌতিক গল্প

হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **ভৌতিক গল্প** ১০৲
আনন্দ বাগচি ॥ **মুখোশের মুখ** ৮৲
কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর রহস্য গল্প** ১০৲
কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর রোমাঞ্চ গল্প** ১০৲
কোনান ডয়েল ॥ **কিশোর গোয়েন্দা গল্প** ১০৲
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **মোহনপুরের শ্মশান** ৬৲
দেবব্রত চক্রবর্তী ॥**শেরিংহত্যা রহস্য** ১০৲
হেমেন্দ্রকুমার রায় ॥ **যক্ষপতির রত্নপুরী** ৬৲
দীনেন্দ্রকুমার রায় ॥ **যখের আসন** ১০৲

সম্প্রতি প্রকাশিত

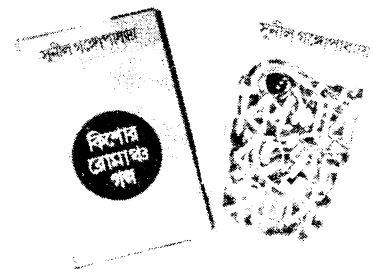

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের

কিশোর রহস্য গল্প

কিশোর রোমাঞ্চ গল্প

প্রতিটি দশ টাকা

পশুপাখি বনজঙ্গলের গল্প

অমিতাভ চক্রবর্তী **ছোটদের বাঘের গল্প** ৮৲
কেনেথ আন্ডারসন
শিবানীপল্লীর কালো চিতা ২০৲
যোগীন্দ্রনাথ সরকার ॥ **বনে জঙ্গলে** ১৫৲
অজয় হোম ॥ **বিচিত্র জীবজন্তু** ১২৲
কেনেথ অআন্ডারসন
মানুষখেকোর বিভীষিকা ১৫৲

গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ॥ **বাঙলার গাছপালা** ১৫৲
প্রেমেন্দ্র মিত্র॥ **মেজো কর্তার ভৌতিক গল্প** ১৫৲
খগেন্দ্রনাথ মিত্র ॥ **শেকসপীয়ারের গল্প** ১০৲
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ॥ **ছোটদের মজার গল্প** ১০৲
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়॥ **সবার প্রিয় টেনিদা** ১০৲

ষষ্ঠ বর্ষ ঃ ষষ্ঠ-সপ্তম সংখ্যা অক্টোঃ-নভেঃ 1986

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান

সূচীপত্র

চিঠিপত্র 2 ঃ দপ্তর থেকে ঃ চলমান মঙ্গল ॥ সমরজিৎ কর 5

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ঃ প্রজেক্ট এইচ ॥ নিরঞ্জন সিংহ 9 ঃ ধাতব মানুষ ॥ (জ্যাক উইলিয়ামসন) অনু ঃ সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় 24 ঃ শিশু রোবোট রোবু ॥ শৈল চক্রবর্তী 37

বিশেষ রচনা ঃ সমুদ্রকে বাঁচাও ॥ সুবীর দত্ত 21

পড়াশোনা ঃ পদার্থবিজ্ঞানের কথা ॥ অজয় চক্রবর্তী 63 ঃ ল.সা.গু প্রসঙ্গে ॥ অসীম মুখোপাধ্যায় 17 ঃ প্রাণিকলা, তরুণাস্থি ও রক্ত ॥ দিনোজ কুমার দে 19 ঃ পদার্থের অবস্থান্তর পরিবর্তন ও রাসায়নিক সমীকরণ ॥ বিবেক রায় 61

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ রচনা ঃ যাদু ও বিজ্ঞান ॥ অজিতকৃষ্ণ বসু 7 ঃ হাতি সমস্যা ॥ রাজা রায় 69 ঃ অয়নার কথা ॥ প্রতাপ চট্টোপাধ্যায় 72 ঃ মজার ইলেক্ট্রনিক্স প্রজেক্ট ॥ পার্থসারথি চক্রবর্তী 35 ঃ রত্নেন্দ্র জন্মবার্ষিকী জাদুবর্গ ॥ গোপাল চক্রবর্তী 36 ঃ গ্রহাণু ॥ মৃন্ময়ী দাস 40 অঙ্কে মজার ধাঁধা ॥ অনাবিল সিদ্ধান্ত 64

রঙিন বিচার ঃ আমাকে ধরবে ? ॥ শৈল চক্রবর্তী 13 ঃ চেনা-অচেনা জীবজন্তু ॥ অমরনাথ রায় 14 ঃ জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট 16 ঃ জুনিয়র ফটো ক্যুইজ কনটেস্ট 16 ঃ জংলি নাকরি ॥ অজয় হোম 65 ঃ আই কিউ টেস্ট 65 ঃ হাসনাহানা ॥ এণাক্ষী বিশ্বাস 66 ঃ জীবনদায়িনী ভেষজ সর্পগন্ধা ॥ সীমা সেন 67 ঃ সিনিয়র ক্যুইজ ও জুনিয়র ফটো ক্যুইজ কনটেস্ট 68 ঃ শব্দকূটের সমাধান 68

আবিষ্কারের গল্প ঃ স্যাকারিন একটি আকস্মিক আবিষ্কার ॥ আব্দুল হক খন্দকার 46 ঃ ছাতা আবিষ্কারের কাহিনী ॥ নির্মলকান্তি ঘোষ 48

বিশেষ ক্রোড়পত্র ঃ বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ চাই ॥ সুভাষ চক্রবর্তী 29 ঃ আমরা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করিনা ॥ রণজিৎ মুখোপাধ্যায় 49 ঃ বিজ্ঞানের সাফল্য সকলের জন্য ॥ সৌরেন ভট্টাচার্য 31 ঃ বিজ্ঞান আন্দোলনে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে ॥ সৌমিত্র লাহিড়ী 50

ছবিতে গল্প ঃ খুদে বিজ্ঞানী ॥ দিলীপ দাস 25 ঃ ওয়ার অব্ দি ওয়ার্ল্ডস ঃ এইচ জি ওয়েলস্ ॥ গৌতম কর্মকার 53

কবিতা ঃ ভারতের এ্যাটম ভাবনা ॥ কবিতা সিংহ 23

বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী ঃ প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ ॥ দিবাকর সেন 33 ঃ অগ্রজ রসায়নবিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র ॥ জয়ন্ত মণ্ডল 45

ধারাবাহিক উপন্যাস ঃ নরবানরের গ্রহে ॥ অদ্রীশ বর্ধন 41

ছোটদের দপ্তর ঃ উত্তরদাতাদের নাম 77 ঃ অটোম্যাটিক টাইমার সার্কিট ॥ সুরজিৎ সাহা 73 টুইং ক্লিং লাইট ॥ মলয় খাটুয়া 74 ঃ শব্দকূট ॥ সুকৃৎ ঘোষ 75 ঃ প্রশ্নোত্তর ॥ সুধাংশু পাত্র 79

প্রচ্ছদ ঃ সুশান্ত বিশ্বাস অন্যান্য ছবি ঃ শৈল চক্রবর্তী, হিমানীশ গোস্বামী, অলয় ঘোষাল, পার্থ মণ্ডল

প্রধান সম্পাদক ঃ সমরজিৎ কর। সম্পাদক ঃ রবীন বল। সহসম্পাদক ঃ জয়ন্ত দত্ত।

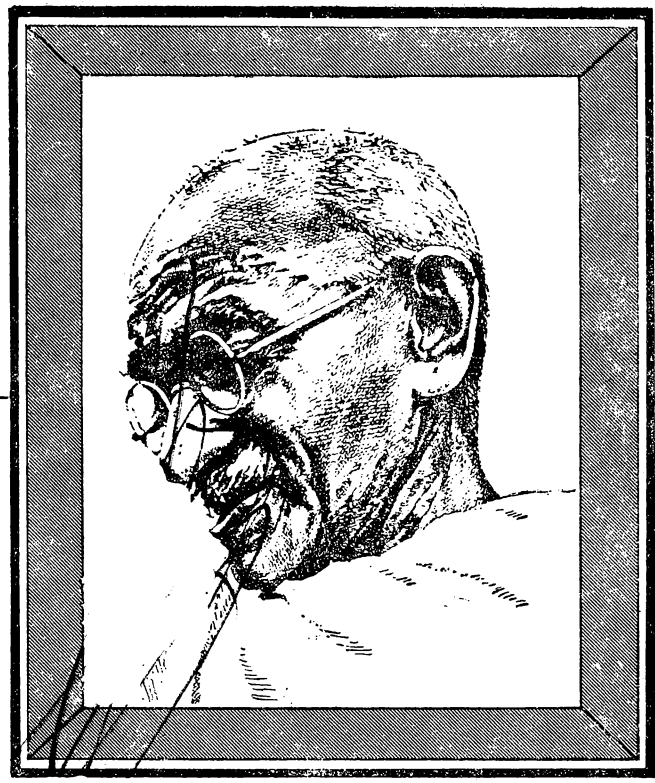

মহাত্মাজীর ধর্ম

"আমার ধর্ম কোন ভৌগলিক সীমার মাঝে
আবদ্ধ নেই। আমার ধর্মের ভিত্তি হল ভালবাসা
এবং অহিংসা। আমার ধর্ম কাউকে ঘৃণা
করতে শেখায় না।
ধর্ম মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে নয়—
তা শেখায় সকলকে ভালবাসার বন্ধনে বাঁধতে।"
এটাই ছিল মহাত্মাজীর ধর্ম

ভালবাসা এবং সহনশীলতার প্রকৃত ধর্ম

davp 86/229 Ben

'পড়াশোনা' বিভাগে প্রকাশিত রচনা প্রসঙ্গে

আগস্ট '86 সংখ্যার কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানে একটি ভুল নজরে পড়ল। রসায়নে যোজ্যতা প্রবন্ধে বিবেক রায় লিখেছেন ফসফেট (PO_4) মূলকের যোজ্যতা দুই। কিন্তু ফসফেট (PO_4) মূলকের যোজ্যতা তিন। এটা কি লেখকের ভুল না ছাপাখানার ?

শান্তনু দাস, দাসপুর বিবেকানন্দ উচ্চ বিদ্যালয়, হাওড়া।

ছন্দোময় মণ্ডল, বি 15/77 লেক প্লেস, কল্যাণী নদীয়া।

'রসায়ন ও তাঁরা ভাষা' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব 14। কিন্তু অক্সিজেনের পারমাণবিক গুরুত্ব প্রকৃতপক্ষে 16।

বিপ্লব মণ্ডল কামারঘুথা হাবরা, 24-পরগনা।

কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের নিয়মিত পাঠক হিসেবে রসায়ন বিভাগের লেখকদের প্রতি আমার একটি অনুরোধ আছে। নিম্নলিখিত মৌলগুলির প্রতীক চিহ্ন ও পর্যায় সারণী এদের অবস্থানগুলি যদি পত্রিকার পাতায় লেখেন তাহলে উপকৃত হব। মৌলগুলি হলঃ রুথেনিয়াম, কুরচা টোডিয়াম, নীলস বোরিয়াম, প্রমেথিয়াম, অ্যাসটা টিন, কুরিয়াম, নেপচুনিয়াম, প্লুটো নিয়াম, কার্জিয়াম, আমেরিসিয়াম, ক্যালেফোর্নিয়াম ইত্যাদি।

সুজিত দাস, কলকাতা-54।

পড়াশুনা বিভাগে 'মজার গুণফল' প্রসঙ্গে জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত আমার রচনাটিতে সামান্য ত্রুটি রয়ে গেছে। কিছু চিঠিপত্রও দপ্তরে এসেছে। এজন্য আমি দুঃখিত। যেমন,

$$207-7=200$$
$$194+6=200$$
$$401 \quad 58$$

এখানে 200 থেকে 42 বিয়োগ করলে হবে 158। 158 এর 58 গুণফলের ডানদিকে বসাতে হবে। 20 এর বর্গ করলে হয় 400। 400 এর 1 যোগ করলে হয় 401 তা 58 এর ডানদিকে বসাতে হবে।

শান্তি নন্দী নাটাগড়, 24-পরগনা।

সেপ্টেম্বর '86তে প্রকাশিত সুভাষ মজুমদারের লেখায় একটা ভুল লক্ষ্য করলাম। লেখক 'মৌলিক সংখ্যার মজা' লেখায় 1 থেকে 101 পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যার উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 1, 3 এবং 7 লিখেছেন। 5 কি মৌলিক সংখ্যা নয় ? **চঞ্চল চ্যাটার্জী**। বেলঘরিয়া।

'রসায়নের যোজ্যতা' শীর্ষক লেখায়—যোজ্যতার পরিভাষা দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন যে, 'কোন মৌলের একটি পরমাণু যে কয়টি হাইড্রোজেন, ক্লোরিন এবং অক্সিজেন পরমাণুর সঙ্গে যুক্ত হয় বা ঐসব মৌলঘটিত যৌগ থেকে যত সংখ্যক হাইড্রোজেন, ক্লোরিন ও অক্সিজেন পরমাণুকে উপস্থাপিত করে সেই সংখ্যাই মৌলের যোজত্যা।' অতএব ZnO, CuO, CaO ইত্যাদি যৌগের Zn, Ca ও Cu একটা O_2 এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বলে পরিভাষানুযায়ী এদের যোজ্যতা = 1 হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা জানি Ca, Cu, ও Zn সবারই যোজ্যতা হল 2।

কুন্তল পাল। টেলকো কলোনী। জামশেদপর।

কিশোর মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা

পত্রিকার পাতায় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসূচী জানতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আরও জানতে পারলাম—পরিষদ তার প্রথম কর্মসূচী গ্রহণ করেছে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরে। পরিষদ গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে এই রকম একটি কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব তা আমরা ভাবতেই পারিনি। আশাকরি পরিষদের এই প্রয়াস সর্বাঙ্গীণ সফল হবে। বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের জন্য ইতিমধ্যে একটি পরীক্ষা প্রচলিত আছে 'সায়েন্স ট্যালেন্ট সার্চ এন্ড অ্যাপটি চিউড টেস্ট' নামে। প্রতি বছর হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী এই পরীক্ষা দিয়ে থাকে বলেও আমরা জানি। সেই সঙ্গে 'কিশোর মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা' প্রবর্তিত হল। এই শুভ প্রচেষ্টার জন্য কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ সকলেরই প্রশংসা নিঃসন্দেহে অর্জন করবে। কিন্তু প্রশ্ন হল এই পরীক্ষার সুযোগ কি শুধু নবম / দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে ? পরিষদের কাছে আমার অনুরোধ তারা যেন পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীপর্যন্ত এই পরীক্ষার প্রচলন করেন এবং পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই যেন তাদের কর্মসূচী অব্যাহত থাকে যাতে পশ্চিম-বঙ্গের উৎসাহী ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করতে পাবে।

রবীন বসু / কলকাতা-36

আমরা উত্তর চব্বিশপরগনা জেলার ছাত্রছাত্রীরা কিশোর মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষায় বসতে চাই।

বিকাশ, করবী, ছন্দা ও গৌতম।
সংগ্রামপুর। উত্তর 24 পরগনা।

এগিয়ে চলার নয় বছর
শিক্ষা ও সংস্কৃতির নতুন পথ

১৯৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর শিক্ষার প্রসঙ্গটি বিশেষ গুরুত্ব লাভ করল। ৪২,৮৮১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও ৫৯ লক্ষ ৯৩ হাজার ছাত্রসংখ্যা থেকে গত নয় বছরে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে রয়েছে ৫২,৮৮১ টি প্রাথমিক বিদ্যালয়—ছাত্রসংখ্যা ৮০ লক্ষ ৪০ হাজার। এই সময়ে তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্র বেড়েছে যথাক্রমে ১ লক্ষ ২০ হাজার ও ৪৪ হাজার। ষষ্ঠশ্রেণী পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বন্টন করা হচ্ছে। বিনামূল্যে জলখাবার পাচ্ছে ৩২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রী। গ্রামীণ এলাকায় সকল তফসিলী ও আদিবাসী ছাত্রী ও শতকরা ২৫ ভাগ অন্য ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পোশাক বিতরণ করা হচ্ছে। গত নয় বছরে ২৫০০ টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে অথবা জুনিয়র হাইস্কুলকে হাইস্কুলে উন্নীত করা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের সুযোগ ছিল ৭৪৩ টি বিদ্যালয়ে এবং ১৬৪ টি কলেজে। বর্তমানে ১১১৯ টি বিদ্যালয় ও ২৬৮ টি কলেজে এই সুযোগ রয়েছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য শিক্ষা ও কারিগরী শিক্ষারও যথেষ্ট উন্নতিসাধন করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত শিশুদের জন্য ১৮,২৬০ টি বিধিমুক্ত শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। উচ্চ-শিক্ষার প্রসারের জন্য খোলা হয়েছে ৫০ টির ওপর নতুন কলেজ এবং একটি বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৮৬-৮৭ সালে বামফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের জন্য শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছেন ৬৩৯ কোটি টাকা, যেখানে সমগ্র দেশের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দ ৬৩৬ কোটি টাকা। প্রতিবছর শিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয় পশ্চিমবঙ্গে—১০৮ টাকা, কেন্দ্রীয় সরকারের—৮·৭৫ পয়সা। বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ২৩ শতাংশ রাজ্য সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় করেন। কেন্দ্রীয় সরকারের এই বাবদ বরাদ্দ বাজেটের মাত্র ১·২ শতাংশ।

এছাড়াও শিক্ষালাভের সুযোগ সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে প্রসারিত করার জন্য গত নয় বছরে ১৭৬১ টি নতুন গ্রন্থাগার গড়ে তোলা হয়েছে। ১৯৭৭ সালে ৭৬২ টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে রাজ্যে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ২৫২৩ টি। উৎসাহী ক্রেতার কাছে ভাল বই পৌঁছে দেবার জন্য সরকারী সাহায্যে রাজ্য পর্যায়ে ৩ টি এবং জেলা পর্যায়ে ১৬ টি গ্রন্থমেলা হয়েছে। সম্পূর্ণ সরকারী উদ্যোগে ও একটি বইমেলা হয়েছে। গবেষক, উৎসাহী পাঠক এবং ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তার কথা মনে রেখে সরকার একটি আধুনিকতম গ্রন্থপঞ্জীর মুদ্রণ ও প্রকাশনের কাজে হাত দিয়েছেন।

সুস্থ সংস্কৃতির প্রসারে ও লোকসংস্কৃতির ধারাকে চলিষ্ণু রাখার স্বার্থে অনেকগুলি প্রকল্প রূপায়িত হয়েছে এবং হচ্ছে। দুঃস্থ শিল্পীদের আর্থিক সাহায্যদান ও সাহিত্য প্রকাশনায় অনুদান প্রদান এগুলির অন্যতম। শিল্প, সঙ্গীত ও নাটকের ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে অবনীন্দ্র, আলাউদ্দীন ও দীনবন্ধু পুরস্কার। নেপালী সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেওয়া হচ্ছে ভানুভক্ত পুরস্কার। এছাড়া স্থাপিত হয়েছে নেপালী, বাংলা ও উর্দু আকাদেমী এবং সঙ্গীত আকাদেমী। আদিবাসী মানুষদের কৃষ্টিকে রক্ষা করতে গড়ে তোলা হয়েছে উপজাতি সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র—সিউড়ি, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম ও আলিপুরদুয়ারে। চলচ্চিত্রকে উন্নতমানের করার জন্য স্থাপিত হয়েছে একটি কালার ফিল্ম ল্যাবরেটরি এবং প্রেক্ষাগৃহ ও কৃষ্টিকেন্দ্র "নন্দন"। উত্তর কোলকাতায় স্থাপিত হয়েছে গিরিশ মঞ্চ।

সবাইকে শিক্ষার সুযোগ দেওয়া এবং শিক্ষার ও সংস্কৃতির অঙ্গনকে কলুষমুক্ত রাখার জন্য আজ আমাদের একতাবদ্ধ হবার দিন॥

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

চলমান মঙ্গল সমরজিৎ কর

এতকাল আমরা জানতাম, পৃথিবীর স্থলভাগ চলমান। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় কন্‌টিনেন্‌ট্যাল ড্রিফট' বা মহাদেশীয় সঞ্চরণ, সেটা পৃথিবীতেই একমাত্র ঘটে। এখন যেখানে দক্ষিণ মেরু, একসময় ওই অঞ্চলে ছিল অতিকায় এক মহাদেশ—গণ্ডোয়ানা ল্যাণ্ড। সেই মহাদেশ পরে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এক একটি টুকরো অত্যন্ত ধীর-গতিতে ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে। আজকের ভারতভূখণ্ড সে সব টুকরোরই একটি। আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং দক্ষিণ আমেরিকাও তাই। কিন্তু এখন জানা গেল, এ ধরনের ঘটনা শুধু পৃথিবীতেই নয়, মঙ্গল গ্রহেও ঘটেছে। এখনো ঘটছে।

মার্কিন মহাকাশযান 'মেরিনার', 'পাইওনিয়ার' এবং 'ভাইকিং' মঙ্গলের বিভিন্ন অঞ্চল সম্পর্কে নানারকম তথ্য সংগ্রহ করেছিল বেশ কয়েক বছর আগে। সেই সব তথ্য বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা এখন বলছেন, মঙ্গল গ্রহের নিরক্ষীয় অঞ্চলে এখন যে অঞ্চলটি বিরাজ করছে, এক সময় ওই অঞ্চল গ্রহটির মেরুর কাছাকাছি অবস্থান করতো। মনে হয়, গ্রহটির ভূস্তর কোন দিনই এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকে নি। অত্যন্ত ধীরগতিতে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় সরে গেছে অথবা এগিয়ে এসেছে।

নতুন এই আবিষ্কার সত্যিই ধাঁধায় ফেলেছে বিজ্ঞানীদের। সত্যিই তো। গত একশ' বছর ধরে পৃথিবীর প্রতিবেশী এই গ্রহটি নিয়ে কতই না কল্পনা। সে সব কথা তোমাদেরও অজানা নেই। অনেকে কল্পনা করেছিলেন, মঙ্গলের বুকে হয়ত বিরাজ করছে বিচিত্র রকমের প্রাণী এবং উদ্ভিদ। হয়ত পৃথিবীর মত নদী সমুদ্র জলাও রয়েছে সেখানে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, সে সব কিছুই সেখানে নেই। গত বছর মার্কিন বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন, মঙ্গলের বুকে জল পাওয়া না গেলেও, সম্ভবত এই গ্রহটি একেবারে নির্জলা নয়। ওই গ্রহটির ভূস্তরের নিচে রয়েছে অফুরন্ত জল। যা দিয়ে পৃথিবীর সব কটি মহাসাগরও তৈরি করা যায়। কথাটা সত্যি কিনা সেটা 1991 সালেই জানতে পারবো। ওই বছর মার্কিন দেশ মঙ্গলের বুকে নামাবেন একটি মহাকাশযান। সেখানে ভূস্তরের নিচে জল আছে কিনা হয়ত তখন তা জানা যাবে।

কিন্তু এখন যা বলছিলাম—মঙ্গলের চলমান ভূস্তর। বিজ্ঞানীরা আপাতত যা জানিয়েছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। যেমন ধরো, ওঁরা বলছেন, অবাক কাণ্ড! একই অক্ষাংশ। অথচ তার কোন জায়গায় শিলাস্তরে ক্ষয় কম। মনে হয়, দশ লক্ষ বছরে মাত্র এক মিলিমিটারের মত। এত কম ক্ষয় হওয়ার কারণ কি? জলপ্রবাহে অথবা বাতাসের প্রবাহে শিলা ক্ষয়ে যায়, একথা সবাই তো জানো। ক্ষয়ের কারণ যদি জলবাতাস হত, তাহলে অতটুকু ক্ষয় হবে কেন? কোথাও ক্ষয়ের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। এবং সেই ক্ষয়-সাধনের পেছনে যে কাজ করেছে বায়ুপ্রবাহ, তারও প্রমাণ রয়েছে। এমনটি কেন হলো? একই অক্ষাংশ। অথচ একজায়গায় শিলাস্তর বাতাসে অতটা ক্ষয়ে গেছে, অথচ অন্যত্র ক্ষয় হয়নি বললেই চলে। এর কারণ কি? মঙ্গলের বহু জায়গায় দেখা গেছে গভীর খাদ। বোঝা যায়, অতীতে মঙ্গলের বুকে ছিল জলের প্রচণ্ড ধারা। সেই জলের ধারা এবং কাদামাটির প্রবাহে সেখানকার বহু অঞ্চলে কঠিন পাথর ক্ষয়ে গিয়ে সৃষ্টি করেছে বড় বড় খাদ। বিজ্ঞানীরা জেনেছেন ওই গ্রহটির মেরু অঞ্চল ঢেকে রেখেছে কঠিন শিলা। শিলার উপর পুরু বরফের আস্তরণ। কিন্তু মজার ব্যাপার এই সেখানকার শিলার বয়েস গ্রহটির অন্যান্য অঞ্চলের শিলার বয়েসের চেয়ে অনেক বেশি। এরই বা কারণ কি? বলতে কি বিজ্ঞানীদের কাছে এটাও একটা ধাঁধা।

এই ধাঁধার ব্যাপারটা নিয়ে মার্কিন মহাকাশ সংস্থা 'নাসা'র গবেষক পিটার এইচ. সুল্‌টজ মাথা ঘামাচ্ছেন এখন। তিনি বলেছেন, দেখে শুনে মনে হচ্ছে, সেখানকার ব্যাপারটাই যেন কেমন। পৃথিবীর মত মঙ্গলও তার অক্ষের চারপাশে ঘুরছে। সেই অক্ষের কোন পরিবর্তন হয় নি। তবে একটা কথা বোঝা যায়, গ্রহটির যে ভূস্তর এখন মেরুর কাছাকাছি, এক সময় তা ছিল মেরু থেকে অনেক দূরে। অর্থাৎ ব্যাপারটা যেন এই রকম: ধরো, মঙ্গলের পৃষ্ঠের অংশটি যেন কমলা লেবুর খোসার মত। কল্পনা করো, লেবুর ভেতরের অংশ একই রকম রইলো, অথচ তার খোসাটি চলমান। মঙ্গলেও ঘটছে একই রকম কাণ্ড। মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশ এদিক সেদিক বিচরণ করছে। এর ফলে, ওই গ্রহটির ভৌগোলিক মেরু কখনো স্থির নয়, মানে চিরকাল একই জায়গায় থাকে না, স্থান পরিবর্তন করে।

দেখে মনে হয়, মঙ্গলের ভূতাত্ত্বিক গঠনও পৃথিবীর মত। পৃথিবীর কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে বলা হয় 'কোর'। এই 'কোর'-এর ভেতরের অংশ কঠিন, বাইরের অংশ তরল। 'কোর'কে ঢেকে রয়েছে আর একটি স্তর। যার নাম 'ম্যানটল'। আর 'ম্যানটল্‌'কে ঢেকে রেখেছে পুরু বাইরের ভূস্তর। মঙ্গলের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা এই রকম। পৃথিবীর মত মঙ্গলের গভীর ভূতাত্ত্বিক অঞ্চলও উত্তপ্ত-গলিত। কোথাও ভেতর থেকে বাইরের ভূ-স্তরে চাপ বাড়ছে, কোথাও চাপ কমছে।

সেই চাপেই মঙ্গলের বাইরের ভূ-স্তর স্থান পরিবর্তন করে।

আরো একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন বিজ্ঞানীরা। মঙ্গলের দুই মেরুতে শীতে বরফ জমে বেশি। সেই বরফের বেশির ভাগই কার্বন ডাই-অক্সাইড, কিছু অংশ জল। গ্রীষ্মে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাষ্পীভূত হয়ে উড়ে যায়। বরফ হিসাবে যেটুকু পড়ে থাকে তার বেশির ভাগটাই জলের বরফ। দুই মেরুর 10 ডিগ্রির মধ্যে দেখা গেছে স্তরীভূত অঞ্চল। দক্ষিণ মেরুর কাছে সেই স্তরের গভীরতা এক থেকে দুই কিলোমিটার। উত্তর মেরুর কাছে চার থেকে ছয় কিলোমিটারের মত। বরফে ক্ষয়ে যাওয়া পাথরকণা এবং বরফবাহিত পাথর জমে তৈরি হয় ওই সব স্তর। স্তরের মধ্যে থাকে কাদামাটি এবং কম করেও 25 শতাংশ জল। বাতাস এবং জলের প্রবাহে এই স্তরগুলির ক্ষয় হচ্ছে আবার ধূলিকণা, কাদা এবং পাথর জমে তৈরি হচ্ছে নতুন স্তর। সম্ভবত এর জন্যে মহাকাশযানের যান্ত্রিক চোখে মনে হয়েছে, মঙ্গলের অন্যান্য অঞ্চলের ভূস্তরের বয়েস তার মেরুর কাছাকাছি ভূস্তরের বয়েসের চেয়ে কম। একই ঘটনা মঙ্গলের অন্যান্য অঞ্চলেও দেখা গেছে। এ থেকে মনে হয়, ওই গ্রহের দুটি মেরু সময়ে সময়ে স্থান পরিবর্তন করেছে।

যাই হোক, 1991 সাল তো মাত্র বছর পাঁচের ব্যাপার। ওই বছর মার্কিন মহাকাশযান নিয়ে যাবে বিশেষ ধরনের গাড়ি। যেমন নিয়ে যাওয়া হয়েছিল চাঁদে। সেই গাড়িতে নানা যন্ত্র—মঙ্গলকে আরো খুঁটিয়ে পরীক্ষা করার জন্যে। তখন তোমরা নিশ্চয় ওই গ্রহটি সম্পর্কে অনেক চমকপ্রদ তথ্য জানতে পারবে।

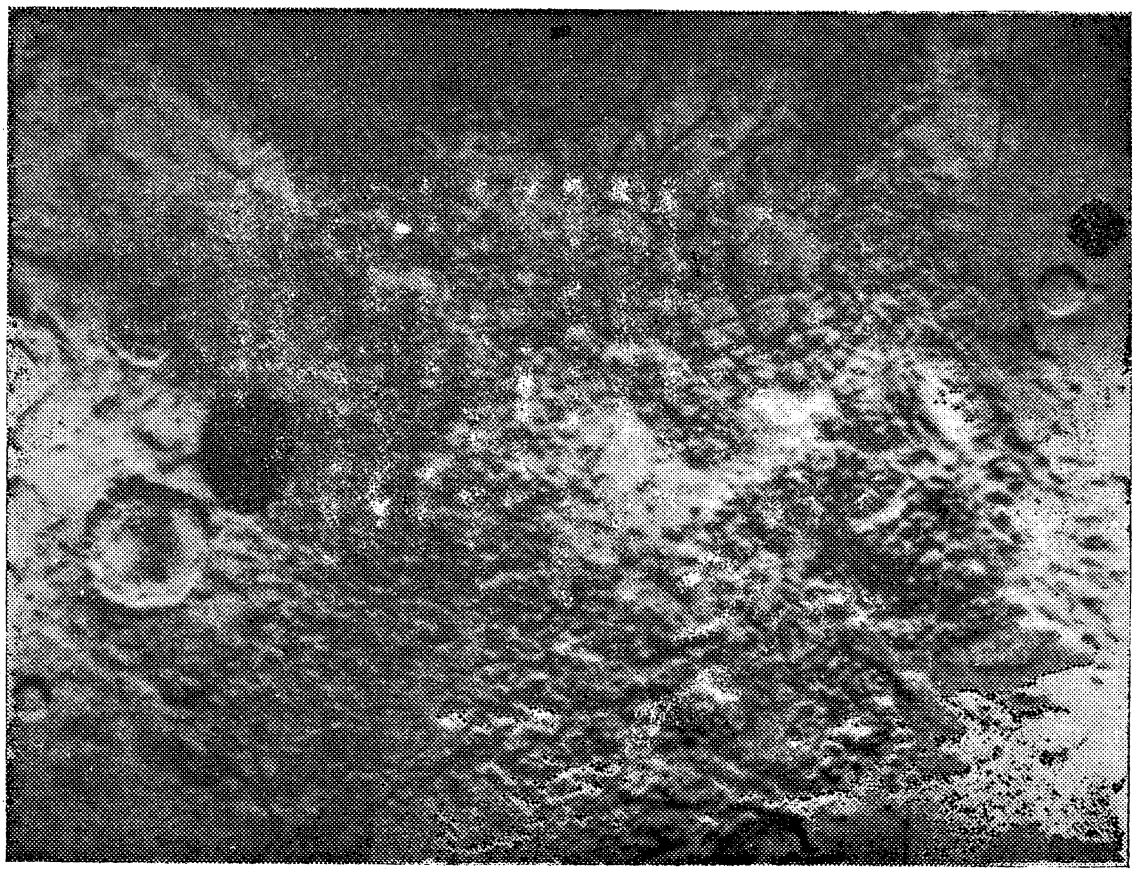

চলমান মঙ্গল

যাদু ও বিজ্ঞান

অজিতকৃষ্ণ বসু

1926 সালের 25শে ডিসেম্বর সন্ধ্যায়—আমি তখন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র—ঢাকার রেলওয়ে ইনস্টিটিউট হলে অদ্ভুত যাদু প্রদর্শন দেখলাম তখনকার অন্যতম সেরা যাদুকর 'রয় দ্য মিস্টিক' (Roy the Mystic) অর্থাৎ যতীন্দ্রনাথ রায়ের। প্রায় আড়াই ঘণ্টা নানারকম অতি আশ্চর্য যাদুর খেলা দেখিয়ে তিনি হলশুদ্ধ সবাইকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন, মনে হচ্ছিল প্রকৃতির বাঁধা নিয়মগুলিকে তিনি যেন তাঁর অলৌকিক যাদুর জোরে উল্‌টে দিচ্ছেন।

তাঁর খেলাগুলির মধ্যে আমাকে সবচেয়ে বেশি অভিভূত করেছিল তাঁর 'গার্ল ইন দ্য মিড-এয়ার (GIRL IN THE MID-AIR) অর্থাৎ একটি বালিকাকে শুধুমাত্র খাড়া একটি লাঠির ডগায় তার কনুই ঠেকিয়ে রেখে অন্য কোনো রকম অবলম্বন ছাড়াই হাওয়ার ওপর লম্বালম্বি ভাসিয়ে রাখা। তার আগে তিনি মেয়েটিকে 'হিপনোটাইজ' (hypnotize) অর্থাৎ সম্মোহন করে তার শরীরটাকে এমনভাবে হাওয়ার চাইতে হাল্‌কা করে ফেলেছেন যেন সে সেই কারণেই অনায়াসে হাওয়ার ওপর ভেসে থাকে।

আমরা তখন বিজ্ঞানের সহজ পাঠ পড়তাম, মাধ্যাকর্ষণের বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটুকু জানা ছিল। পৃথিবী সব কিছুকেই তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে (অর্থাৎ টানে); এই আকর্ষণের নাম মাধ্যাকর্ষণ। একটি গল্পে পড়েছিলাম গাছ থেকে একটি আপেলকে পড়তে দেখেই নাকি ইংরাজ বৈজ্ঞানিক স্যার আইজ্যাক নিউটন-এর মাথায় মাধ্যাকর্ষণের কল্পনাটি এসেছিল।

এই খেলাটিই ফরাসী যাদুসম্রাট রবেয়ার উদ্যাঁ (Robert Houdin)* ফরাসী রাজধানী পারী (Paris) শহরে দেখাতে শুরু করেন 1847 সালে। এ খেলায় তিনি শূন্যে ভাসিয়ে রাখতেন তাঁর ছয় বছর বয়স্ক ছোট ছেলেকে। তাকে তিনি হিপ্‌নোটাইজ করতেন না, অচেতন আর হাওয়ার চাইতে হাল্‌কা করার ভান করতেন ইথার শুঁকিয়ে। তাই তাঁর খেলার সূচীতে তিনি এ খেলাটির নাম দিয়েছিলেন "ইথারিয়্যাল সাস্‌পেনশ্যান", যা থেকে দর্শকবৃন্দ ধারণা করে নিতে পারেন যে শূন্যে ভাসিয়ে রাখা হচ্ছে ইথার প্রয়োগে ছেলেটির শরীর হাল্‌কা করে।

এ বিষয়ে উদ্যাঁ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ

1847 সালে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার করার আগে তাঁকে ইথার শুঁকিয়ে অচেতন এবং অস্ত্রোপচার করবার জায়গাটি অসাড় এবং ব্যথা-অনুভূতিহীন করে নেবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হতো। তাতে এমন আশ্চর্য সুফল পাওয়া যেতো, যে অনেকেই ইথারের প্রশংসা করে বলতেন, শল্য চিকিৎসায় এ জিনিস যাদুর মতো কাজ করে। চিকিৎসকেরা এভাবে যাদুর এলাকায় প্রবেশ করছে দেখে ভাবলাম যাদুকর-আমি এদের ওপর টেক্কা দেব চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের জিনিস তাদের চাইতে বেশি বিস্ময়কর যাদুর খেলায় প্রয়োগ করে তাক লাগিয়ে। এই ভেবেই আমি এ খেলাটি উদ্‌ভাবন করলাম।"

ছয় বছরের ছেলে ইউজিন এত ভালো অভিনয় করত যে দর্শকেরা ভাবতেন সত্যিই সে ইথার শোঁকার ফলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে অসাড় হয়ে গেছে।

তার ফলে বেশ কিছু সহৃদয় দর্শক ঐ বাচ্চা ছেলেটির জন্য ভীষণ দুর্ভাবনায় পড়েছিলেন। অনেকে উদ্যাঁকে কড়া চিঠিতে লিখলেন, "আপনি বেচারা ছেলেটির ওপর কেন এত নিষ্ঠুর? ইথারের রাসায়নিক ক্রিয়া অত্যন্ত কড়া; ঐ কচি ছেলের ওপর ঘন ঘন ইথার প্রয়োগ করে আপনি তার স্বাস্থ্য—এমন কি হয়তো জীবনও বিপন্ন করছেন।"

অনেকে উদ্যাঁকে হুঁশিয়ারী দিলেন তিনি যদি কচি শিশুর ওপর এই বর্বর আচরণ থেকে বিরত না হন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে আইনের সাহায্যে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আসলে কিন্তু উদ্যাঁ ছেলেকে ইথার শোঁকাতেন না, শোঁকাবার ভান করতেন মাত্র। যে শিশির ছিপি খুলে শিশির মুখটা ছেলের নাকের সামনে ধরতেন, তাতে এক ফোঁটা ইথারও থাকত না।

রবেয়ার উদ্যাঁ (1805—1871) এই খেলাটিকে যে রূপ দিয়েছিলেন, সেই রূপেই এখনও খেলাটি দেখানো হয়ে আসছে—এ খেলায় একটি ছেলে বা মেয়েকে যাদুকর একটি খাড়া লাঠির ডগায় তার কনুই ঠেকিয়ে হাওয়ার ওপর শুইয়ে রাখেন, দর্শকদের মনে হয়, বিজ্ঞানের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বটিকে তিনি এ খেলায় বাতিল করে দিয়েছেন।

এই খেলাটিই 1926 সালে 'রয় দ্য মিস্টিক'-এর যাদু-প্রদর্শনে দেখে অভিভূত হয়ে সেই যে যাদু-চর্চায় মেতে উঠেছিলাম, সেই নেশা সারা জীবন আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, আজও ছাড়েনি।

এই খেলাটিই সেকালের বিখ্যাত যাদুকর এমিন সোহরাবর্দিকে 1908 সালে ঢাকা শহরে দেখেই বালক যতীন্দ্রনাথ

(ভাবী 'রয় দ্য মিস্টিক') অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন যাদুকর হবার সাধনা করতে—অসাধারণ সিদ্ধিও লাভ করেছিলেন।

এই খেলাটি 'বাদুসম্রাট' ৺ পি. সি. সরকার (প্রতুলচন্দ্র) তাঁর ইন্দ্রজাল প্রদর্শনীতে দেখাতেন। তাঁর পুত্র প্রদীপচন্দ্র (পি. সি. সরকার) এখনও দেখান। অন্য অনেক যাদুকরের খেলার ফর্দেও এ খেলাটি আছে, হয়তো আরো অনেকদিন থাকবে।

উদ্যাঁ তাঁর প্রতিভা-বলে খেলাটিকে আধুনিক নবরূপ দিয়েছিলেন বটে, যার মূল্য অসামান্য, কিন্তু খেলার মূল কৌশলটি আবিষ্কার করেছিলেন দক্ষিণ ভারতের এক ব্রাহ্মণ, 'সাধুবাবা জাতীয় এক ব্যক্তি। তাঁর নাম ছিল শেষল। *বিনা অবলম্বনে শূন্যে বসে থাকা-র খেলা তিনি দেখিয়েছিলেন মাদ্রাজে, 1832 সালে –শূন্যে শুয়ে থাকার নয়। তিনি এই খেলাটি ভোজবাজি বা ভেল্‌কি হিসেবে নয়, এটি যেন একটি যৌগিক ক্রিয়া এই রকম ভান করে দেখাতেন খুব সাধারণ সরঞ্জাম দিয়ে। কাঠের তৈরি ছোট্ট চারটি পা-ওয়ালা একটি জলচৌকি, তার একধারে একটি গোলাকার এবং কিছুটা গভীর গর্ত। ব্রাহ্মণ একটি বাঁশের লাঠির এক মাথা এই গর্তে গুঁজে দিয়ে লাঠিটিকে জলচৌকির ওপর খাড়া করে রাখতেন। এই বাঁশের লাঠির ডগার খানিকটা নীচুতে লাঠিটির সঙ্গে বেশ পোক্ত করে লাগানো ছিল ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল একটি ডাণ্ডা।

খেলাটি দেখাবার আগে ব্রাহ্মণের সহকারী বা ভৃত্যেরা একটি কম্বল সামনে ঝুলিয়ে ধরে সরঞ্জাম সহ তাঁকে দর্শকদের দৃষ্টি আড়াল করে রাখত। কিছু সময় পরে কম্বলের আড়ালটা সরে যেতেই দর্শকরা সবিস্ময়ে দেখতেন ব্রাহ্মণ পদ্মাসন করে শূন্যে বসে আছেন ডাণ্ডার ওপর তাঁর ডান হাতের কনুইটি রেখে, আর ডান হাতে জপের মালার গুটিগুলি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নাম জপ করছেন। ভূমি থেকে ফুট চারেক উঁচুতে হাওয়ার ওপর।

দর্শকবৃন্দ তাঁকে কিছুক্ষণ এ অবস্থায় দেখার পর আবার তাঁর সামনে কম্বল ঝুলিয়ে রেখে তাঁর ভৃত্যেরা তাঁকে দর্শকদের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে দিত। দর্শকবৃন্দ তখন কম্বলের আড়াল থেকে এক রকমের অদ্ভুত আওয়াজ শুনতে পেতেন, যেন পাম্প করা ব্লাডার থেকে হাওয়া বেরিয়ে আসছে হুস্ হুস্ করে। আওয়াজ থেমে যেতেই ব্রাহ্মণের লোকেরা কম্বলের আড়ালটা সরিয়ে নিতেই দেখা যেত ব্রাহ্মণ আবার মাটির (বা মেঝের) ওপর দাঁড়িয়ে আছেন।

মাধ্যাকর্ষণকে জব্দ করা এই অদ্ভুত কাণ্ডটির এই রকম একটি ব্যাখ্যা রটেছিল যে ব্রাহ্মণ হঠযোগ সাধনায় সিদ্ধ, কুম্ভক করে বুকের মধ্যে প্রচুর পরিমাণ হাওয়া আট্‌কে রেখে এবং সেই সঙ্গে আনুষঙ্গিক নানা রকম প্রক্রিয়া করে শারীরিক হাওয়ার চাইতেও এত বেশী 'হাল্‌কা করে ফেলেন যে অনায়াসে হাওয়ার ওপর বসে থাকতে পারেন, গ্যাস-ভরা বেলুন যেমন করে হাওয়ায় ভাসে।

খেলাটি, বলা, বোধ হয় বাহুল্য, বেশ ব্যাপক বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিল এবং কৌতূহলের। খেলাটির বিবরণ ইউরোপেও পৌঁছে গিয়েছিল।

খেলার বর্ণনাটি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল ফরাসী যাদুকর রবেয়ার উদ্যাঁ-র (Robert Houdin)। তাঁর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীসম্পন্ন মন কুম্ভক ব্যাখ্যাটিকে মেনে নিতে পারল না। তিনি ভাবলেন, যদি সত্যিই কুম্ভক দ্বারা দেহের ভিতরে হাওয়া জমিয়ে দেহটাকে হাল্‌কা করা হয়ে থাকে, যাতে সেটি হাওয়ায় ভেসে থাকা সম্ভব, তাহলে ওভাবে ডাণ্ডার ওপর ডান হাতের কনুই ভর করে রাখা দরকার হবে কেন ? অত সরঞ্জামেরই বা কি দরকার ? কেন ঐ জলচৌকি বাঁশের লাঠি, আর ডাণ্ডা ?

তাঁর নিশ্চিত বিশ্বাস হলো খেলাটা যান্ত্রিক—যে ডাণ্ডা আর বাঁশের লাঠি 'অবলম্বন' করে (নিরালম্বভাবে নয়) ব্রাহ্মণটি শূন্যে বসে থাকতেন, তাতেই ছিল যান্ত্রিক কারসাজি, কুম্ভক শক্তি প্রয়োগের ভান নিতান্তই দর্শকদের চিন্তাকে ভুল পথে চালিত করার-ই কৌশল মাত্র। ইংরাজী যাদু-পরিভাষায় এরই নাম 'মিস্‌ডিরেকশন্' (misdirection)।

উদ্যাঁ (Houdin) ঠিক করলেন এই খেলাটি তাঁর যাদু প্রদর্শনের অন্তর্ভুক্ত করবেন, কিন্তু ঠিক এ ভাবে নয়। তাঁর মনে হলো যাদুকর নিজে শূন্যে বসে থাকার চাইতে তাঁর সহকারী কাউকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখলে, এবং বসিয়ে না রেখে তার পুরো শরীরটাকে বাতাসের ওপর লম্বালম্বি শুইয়ে রাখতে পারলে খেলাটা আরো বেশী মনোরম এবং রহস্যপূর্ণ হয়। তিনি তাঁর উর্বর মস্তিষ্ক খাটাতে লাগলেন তারই ফলে জন্ম নিল তাঁর চমৎকার খেলা 'ইথারিয়্যাল সাস্‌পেন্‌শন' (Ethereal Suspention)। যার বর্ণনা আগেই দিয়েছি। 'এয়ারিয়্যাল সাস্‌পেন্‌শন' (Airial Suspention) নামেও খেলাটি পরিচিত।

প্রজেক্ট এইচ

নিরঞ্জন সিংহ

সেদিন পত্রিকা অফিসেই ঠিকানাবিহীন একটা ছোট্ট চিঠি পেলাম, 'প্রিয় জয়ন্ত, 'প্রজেক্ট এইচ' সম্পর্কে একটা সাংবাদিক সম্মেলনে তোমাদের কাগজের প্রতিনিধিকে ভারত সরকার খুব শীঘ্রই সম্ভবতঃ নেমন্তন্ন পাঠাবেন। যদি নেমন্তন্ন পাও আমার একান্ত অনুরোধ তুমি এ সম্মেলনে আসার চেষ্টা কোরো। এ চিঠির কথা গোপন রেখ। শুভেচ্ছা নিও। ইতি, তোমার মাস্টারমশাই সুকুমার সাহা।'

খুবই অবাক হলাম চিঠিটা পেয়ে। সুকুমার বাবু ছিলেন আমাদের কলেজের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। আমাকে খুব ভালবাসতেন। পরে শুনেছিলাম আমেরিকার এক গবেষণাগারে প্লাজমা ফিজিক্স নিয়ে গবেষণা করছেন। বছর পাঁচেক আগে দিল্লীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসে ওঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন জানতে পেরেছিলাম যে উনি আমেরিকা থেকে ফিরে এসে ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থায় যোগ দিয়েছেন। প্রজেক্ট এইচ সম্পর্কে অবশ্য আগে আমি কখনো কিছু শুনিনি।

পরপর কয়েকদিন কেটে গেল কিন্তু কোন খবরই এল না। অবশেষে ঠিক চারঘণ্টার নোটিশে নেমন্তন্ন এলো। আমি মনে মনে প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। তাড়াতাড়ি বার্তা-সম্পাদকের অনুমতি নিয়ে সব ব্যবস্থা করে ফেললাম। পরদিন ভোরে পালাম বিমানবন্দরে যখন একখানা বিশেষ বিমানের সিঁড়িতে পা দিলাম তখনও গন্তব্যস্থল সম্পর্কে কিছুই আঁচ করতে পারলাম না। বিমানে ঢুকতেই দেখলাম জনা সাতেক বিদেশী যাত্রী বসে আছেন। ওঁরা যে আমারই মত কোন সংবাদপত্রের প্রতিনিধ তা বুঝতে অসুবিধে হল না। চারঘণ্টা বিমানযাত্রায় আমরা অবশ্য কেউ কারো সঙ্গে কথা বলিনি। যেরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিতে আমাদের অজানা এক গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তাতে সবাই যে খানিকটা মানসিক চাপে ভুগছিলাম তাতে কোন সন্দেহ ছিল না।

চারঘণ্টা পরে বিমানখানি নামল সাগরের বুকে একটা ছোট্ট দ্বীপে। ছোট বিমানবন্দর থেকে অতিথিশালায় এসে পেঁছুলাম প্রজেক্ট-এইচ এর নাম লেখা জীপে করে। ঘরে ঢুকে বেশ খুশিই হলাম। জানলা দিয়ে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। সুন্দর ফিটফাট ঘর। ব্রেকফাস্ট শেষ করে চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে জানলার পাশের একটা ছোট সোফা দখল করে বসলাম। হঠাৎ দরজায় টোকা পড়ল। দরজা খুলে ঢুকলেন আমার মাস্টারমশায় ডঃ সাহা। বয়স এখন প্রায় পঞ্চাশ। বেশ মজবুত স্বাস্থ্য। মাথার চুল-গুলো পাতলা ও লম্বা এবং সবই প্রায় সাদা। চোখে পুরু লেন্সের চশমা। মুখটা একটু শুকনো শুকনো। কি একটা দুশ্চিন্তায় যেন ভুগছেন বলে মনে হল। আমি সোফা থেকে উঠে এগিয়ে এসে ওঁকে প্রণাম করলাম।

তারপর একটা সোফা এগিয়ে দিয়ে বসতে বললাম। সোফায় বসতে বসতে উনি বললেন, 'জয়ন্ত, দরজাটা বন্ধ করে দাও, তোমার সঙ্গে আমার বিশেষ কিছু কথা আছে।' আমি ওঁর নির্দেশ পালন করলাম।

'শোনো জয়ন্ত, এখন যে কথাগুলো বলব তা ব্যক্তিগত হলেও মনে হচ্ছে ব্যাপারটার সঙ্গে এই প্রজেক্টের ভবিষ্যৎ ও ভারত সরকারের সম্মান জড়িয়ে রয়েছে। অথচ ব্যাপারটা নিয়ে কারো সঙ্গে আলোচনা করতে ভরসা পাচ্ছি না।' থামলেন ডঃ সাহা।

ডঃ সাহার কথা শুনে বুঝতে পারছি এই প্রজেক্টের ব্যাপারে নিশ্চয় কিছু গণ্ডোগোল ঘটেছে। অথচ এই প্রজেক্ট সম্বন্ধে আমি এখনো কিছুই জানি না। কথাটা ওঁকে বলতেই উনি বললেন, 'প্রজেক্ট সম্পর্কে আপাতত সংক্ষেপে বলছি, আজ বেলা দুটোর সময় সাংবাদিক সম্মেলনে সবকিছু বিশদভাবে বলব। সংক্ষেপে এই প্রজেক্টের উদ্দেশ্য হল অফুরন্ত শক্তি উৎপাদন। শক্তির উৎস কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইউরেনিয়াম সবই সীমিত, একদিন তা ফুরিয়ে যাবে। অথচ শক্তি ছাড়া সভ্যতা কোনমতেই এগুতে পারে না। তাই বিজ্ঞানীরা ভাবতে লাগলেন যদি নিয়ন্ত্রিতভাবে 'ফিউসান' ঘটানো যায় তাহলে পাওয়া যাবে অফুরন্ত শক্তি। এর জন্য জ্বালানী হিসেবে ব্যবহৃত হবে হাইড্রোজেন অথবা হাইড্রোজেন আইসোটোপ ডিউটেরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম। হাইড্রোজেন পাওয়া যাবে সমুদ্রের জল থেকে। কিন্তু ব্যাপারটা ভাবা যত সহজ করা তত সহজ নয়। 'ফিউসান' শুরু করতে গেলে দরকার প্রচণ্ড তাপের—সূর্যের ভিতরকার তাপের সমান, যা প্রায় দশকোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের সমান। এ অসম্ভব ব্যাপার কি সম্ভব? বিজ্ঞানীরা কোন কিছুতেই দমেন না……।' একটা কথা বলে দম নেওয়ার জন্য যেন একটুখানি থামলেন ডঃ সাহা।

আমি একমনে ওঁর কথা শুনছিলাম। ফাঁক পেয়ে প্রশ্ন করলাম, 'প্রজেক্ট এইচ' তাহলে 'প্রজেক্ট হাইড্রোজেন?'

উনি ঘাড় নেড়ে বললেন, 'না, ওটা আসলে প্রজেক্ট 'হেলিও'—হেলিও একটা গ্রীক শব্দ যার অর্থ হল সূর্য।

আমি একটু বোকার মত প্রশ্ন করলাম, 'তাহলে কি আপনারা একটা নকল সূর্য তৈরি করছেন?'

'না, ঠিক তা নয়। আমরা সূর্যের শক্তি উৎপাদনের পদ্ধতিটির নকল করছি। অবশ্য পরীক্ষামূলকভাবে হাইড্রোজেন বোমা ফাটাবার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নকল 'ফিউসান' পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছে বলা যায়। ওই ধ্বংসাত্মক শক্তিকে পোষ মানিয়ে আমরা মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করতে চাই।

এতক্ষণে ব্যাপারটা মোটামুটি আমার মাথায় ঢুকল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্যার, আপনারা কি সফল হয়েছেন?'

'হ্যাঁ, হয়েছি। আর সেইজন্যেই এই সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। এই প্রজেক্টের মূল কর্মকর্তা হচ্ছেন ডঃ নটরাজন। প্লাজমা ফিজিক্সের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী। বহুদিন আমেরিকায় ছিলেন, কিছুদিন রাশিয়ার বিজ্ঞানীদের সঙ্গেও কাজ করেছেন। এই প্রজেক্টে উনি একটা অভিনব লেসার রশ্মির সাহায্যে ফিউসান ঘটাচ্ছেন। যাহোক এই ডঃ নটরাজনকে নিয়েই দেখা দিয়েছে সমস্যা।'

'কেন?'

'ব্যাপারটা তোমাকে ঠিক কিভাবে বলব তা বুঝে উঠতে পারছি না। ডঃ নটরাজনের কী যেন হয়েছে।'

'অসুখ বিসুখ কি?' আমি প্রশ্ন করলাম।

'শারীরিক নয়, হয়তো মানসিক।'

'কিছু অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করছেন কি?'

'হাসিখুশি মানুষটা হঠাৎ যেন নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। আমার কেমন যেন সন্দেহ……।'

ডঃ সাহাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে আমি হাল্কা ভাবে বলে উঠলাম, 'এরকম একটা অভিনব প্রজেক্টের সাফল্যের কথা সারা পৃথিবীর সাংবাদিকদের সামনে প্রকাশ করবেন, এ অবস্থায় বেশ খানিকটা মানসিক চাপ সৃষ্টি হতেই পারে, সুতরাং ও নিয়ে আপনি কোন দুশ্চিন্তা করবেন না।'

'কথাটা আমিও সেইরকমই ভেবেছিলাম। কিন্তু……' বলে একটু থামলেন উনি। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'উনি একা একা প্লান্টে ঘুরে বেড়াবেন কেন?' যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন ডঃ সাহা।

'উত্তেজনায়,' বললাম আমি, 'সব ঠিকঠাক আছে কি না তাই একা একা পরীক্ষা করে দেখছেন।'

'কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে কেন?'

'তারও হয়তো ব্যাখ্যা আছে।' উনি যে ভিতরে ভিতরে নার্ভাস হয়ে পড়েছেন সে কথাটি কাউকে জানতে দিতে চান না।'

'তাও না হয় মেনে নিলাম জয়ন্ত। কিন্তু……' কতকটা স্বগতোক্তির মত বলতে লাগলেন ডঃ সাহা, 'পেলেট ফ্যাক্টরী, অর্থাৎ রিএ্যাক্টরের যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ যার সাহায্যে আলাপনের মাথার মত ছোট্ট জ্বালানী-বড়ি একটা নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ছুঁড়ে দেওয়া হয় রিএ্যাক্টরের কেন্দ্রে, সেটা অকেজো হল কি করে? আর ডঃ নটরাজন নিজে একা একা যখন সব কিছু দেখে বেড়াচ্ছিলেন তখন তিনি ওটাকে তাড়াতাড়ি সারাবার ব্যবস্থা না করে এবং আমাদের কাউকে কিছু না বলে চেপে গেলেন কি উদ্দেশ্যে ……?'

ডঃ সাহার শেষ কথাগুলো শুনে আমিও চমকে উঠলাম। 'স্যার আপনি কি বলতে চাইছেন?'

'আমি কিছুই বলতে পারছি না। শুধু নিজের মনে

এগুলো নাড়াচাড়া করছি আর সন্দেহের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। কেন এই ধরনের উদ্ভট ব্যাপারগুলো ঘটলো? সবই কি ডঃ নটরাজনের নার্ভাসনেসের ফল? কিন্তু ডঃ নটরাজনের সঙ্গে এতদিন কাজ করে এটা বুঝেছি যে উনি মোটেও নার্ভাস প্রকৃতির মানুষ নন।'

'তাহলে কি উনি আসল ডঃ নটরাজন নন?' আমি চাপাস্বরে প্রশ্ন করলাম।

'জানি না।' যেন হতাশ স্বরে জবাব দিলেন ডঃ সাহা।

'আপনার সন্দেহের কথা সিকিউরিটির লোকদের জানিয়েছেন কি?'

'কি করে জানাবো? আমার কাছে তো কোন প্রমাণ নেই। এসব কথা জানাবো তারপর যদি আমার ধারণা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয় তখন?'

ডঃ সাহাকে শান্ত করে খুঁটিনাটি আরো অনেক কথা জেনে নিলাম। তারপর আমরা আরো অনেকক্ষণ চাপাস্বরে আলোচনা করলাম। ডঃ সাহা খুশি হয়ে চলে গেলেন। আমি স্নান খাওয়া সেরে সাংবাদিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তৈরি হয়ে নিলাম।

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দুটোর সময় প্লান্টের ভিতরকার ছোট্ট অডিটোরিয়ামে সাংবাদিক সম্মেলন শুরু হল। মঞ্চের উপরে ডঃ সাহার পাশে ডঃ নটরাজনকে বসে থাকতে দেখলাম। বয়স প্রায় ডঃ সাহার মতই তবে খুব মজবুত দেহ। মুখে একমুখ দাড়িগোঁফ। দাড়িতে একটু সাদা ছোপ লাগলেও মাথার চুল বেশ ঘন ও কুচকুচে কালো। ভদ্রলোককে বেশ গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ বলেই মনে হল আমার। ডঃ নটরাজন সম্মেলন শুরু করলেন এবং ডঃ সাহাকে অনুরোধ জানালেন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে। ডঃ সাহা প্রথমেই এই বলে ক্ষমা চেয়ে নিলেন যে প্রজেক্টের একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় অংশ ঠিকমত কাজ করছে না, আশা করা যাচ্ছে 2/1 দিনের মধ্যে ওটার মেরামতীর কাজ শেষ হয়ে যাবে, তখন সাংবাদিকদের প্রজেক্ট দেখানো হবে। এই সময়টুকু তাঁরা যদি প্রজেক্টের অতিথি হিসেবে কাটান তাহলে প্রজেক্ট কর্তৃপক্ষ খুবই বাধিত হবে।

ডঃ সাহার কথায় বিদেশী সাংবাদিকদের চোখেমুখে একটা যেন অবিশ্বাসের ছায়া খেলে গেল। আমার মনে হল ডঃ সাহার কথা শুনে ডঃ নটরাজন যেন একটু চমকে উঠলেন। অবশ্য ওটা আমার মনের ভুলও হতে পারে। যাহোক ডঃ সাহা প্রজেক্ট এইচ সম্পর্কে বলতে শুরু করলেন। দেখলাম বেশকিছু সাংবাদিক বেশ চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। ডঃ সাহাকে বাধা দিয়ে লম্বামত একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন, 'আপনারা কি সত্যি সত্যি কমার্শিয়াল ফিউসন রিএ্যাক্টর তৈরি করেছেন?'

'হ্যাঁ, করেছি।' শান্তভাবে জবাব দিলেন ডঃ সাহা।

'পৃথিবীতে এব্যাপারে আপনারাই তাহলে প্রথম হলেন, অবশ্য আপনাদের রিএ্যাক্টরের কার্যকারিতা না দেখা পর্যন্ত শেষ কথা বলা যাবে না।' অন্য একজন সাংবাদিক বলে উঠলেন।

'আপনাদের রিএ্যাক্টরে কি ভাবে ফিউসান ঘটানো হয় একটু বলবেন কি ডঃ সাহা?' সেই লম্বামত সাংবাদিকটি আবার প্রশ্ন করলেন। নিশ্চয়। রিএ্যাক্টরের ভিতর অনেকগুলি লেসার বীম ছোঁড়ার ব্যবস্থা আছে আর আছে জ্বালানী বড় ছোঁড়ার ব্যবস্থা। প্রতি সেকেণ্ডে দশটি করে জ্বালানী বড় রিএ্যাক্টরের মধ্যে ছোঁড়া হয়। জ্বালানী-বড়ির উপর চারদিক থেকে এসে আছড়ে পড়ে লেসার-বীম, ঘটে মাইক্রো এক্সপ্লোশান বা সূক্ষ্ম বিস্ফোরণ। এইভাবে সৃষ্টি হবে প্রচণ্ড উত্তাপ ও এসময় শুরু হবে ফিউসান।' 'জ্বালানী-বড়ি কি দিয়ে তৈরি?' জিজ্ঞাসা করলেন মোটামত একজন সাংবাদিক। 'হাই ড্রাজেনের আইসোটোপ ডিউটোরিয়াম ও ট্রাইটিয়াম দিয়ে। ফিউসানের মাধ্যমে এগুলো পরিণত হবে হিলিয়ামে এবং সৃষ্টি করবে অফুরন্ত শক্তি।' 'আমি যতদূর শুনেছি লেসার রশ্মির সাহায্যে ফিউসান ঘটাতে হলে একটা বিশেষ ধরনের লেসার রশ্মির প্রয়োজন হয়। আপনারা কি ধরনের লেসার রশ্মি ব্যবহার করছেন তা কি দয়া করে বলবেন ডঃ সাহা?' লম্বামত সেই সাংবাদিকটি আবার প্রশ্ন করলেন।

ডঃ সাহা ডঃ নটরাজনের মুখের দিকে তাকিয়ে জবাব দিলেন, 'আমরা কারবন-ডাই-অক্সাইড লেসার ব্যবহার করছি।'

ডঃ নটরাজন যেমন শান্তভাবে বসেছিলেন তেমনি বসে রইলেন। কিন্তু ডঃ সাহাকে ভীষণ উত্তেজিত মনে হল। ডঃ সাহা দরজার দিকে তাকিয়ে কাকে যেন ইশারা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারজন লোক দ্রুত মঞ্চের উপর উঠে গেল। ওরা সিকিউরিটির লোক। আমি স্বাস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

'এসব কি ব্যাপার? আপনারা এখানে উঠে এলেন কীজন্য? এখানে একটা সাংবাদিক সম্মেলন চলছে তাকি খেয়াল নেই।' ডঃ নটরাজন সিকিউরিটির লোকদের ধমকে উঠলেন।

'আমাদের সঙ্গে বাইরে চলুন। কোন রকম চালাকির চেষ্টা করবেন না।' হাতের রিভলবারটা ডঃ নটরাজনের দিকে তাক করে বলে উঠল একজন সিকিউরিটির লোক।

মনে হল ভয় পেয়েছেন ডঃ নটরাজন। অসহায়ভাবে তাকালেন উনি ডঃ সাহার দিকে। 'ডঃ সাহা এসব কি হচ্ছে? আমি এই প্রজেক্টের সর্বময় কর্তা তাকি সিকিউরিটির লোকেরা ভুলে গেছে?'

'সেকথা ওরা নিশ্চয় ভোলেনি। তবে আপনি এ প্রজেক্টে সর্বময় কর্তা ডঃ নটরাজন নন। আপনি জাল ডঃ নটরাজন।' তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠলেন ডঃ সাহা।

'এ ধরনের কথা বলার পরিণতি সম্পর্কে আপনি নিশ্চয়

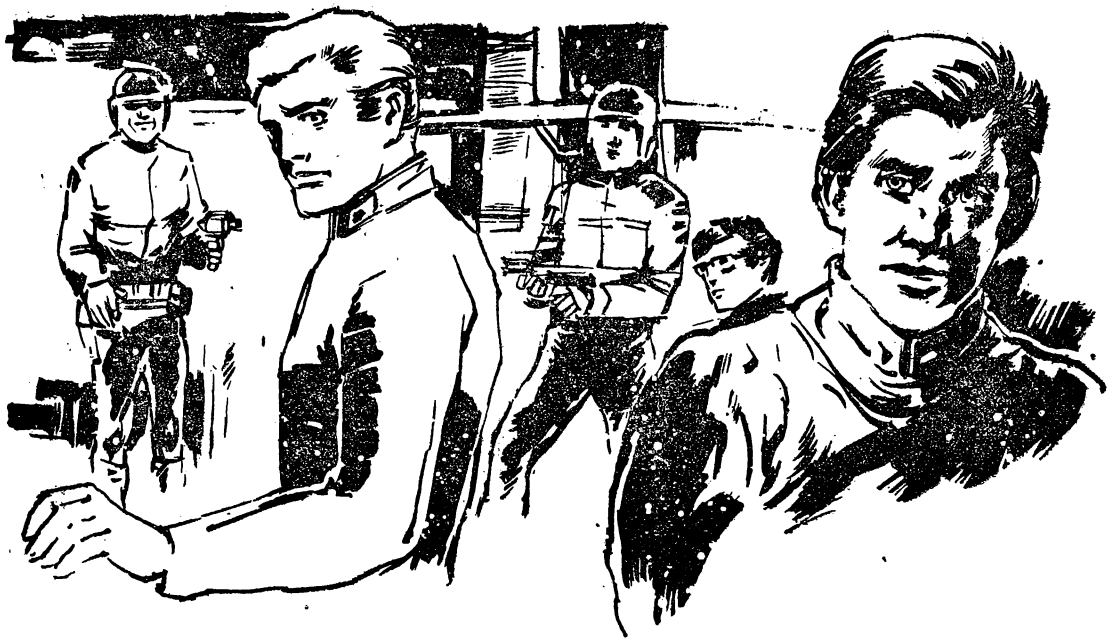

ওয়াকিবহাল ডঃ সাহা? যা বললেন তার প্রমাণ দিতে পারবেন?'

'নিশ্চয়।' দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলেন ডঃ সাহা। 'আমাদের প্রজেক্টে বর্তমানে কি ধরনের লেসার রশ্মি ব্যবহার করা হচ্ছে বলুন তো ডঃ নটরাজন?' 'তাকি আপনি জানেন না? একটু আগেই তো সাংবাদিকদের বললেন।' 'তবু একবার আপনার মুখ থেকে শুনতে চাইছি।'

স্পষ্ট বুঝতে পারলাম জাল ডঃ নটরাজন আমাদের পাতা ফাঁদে পড়েছেন। অসহায়ভাবে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন উনি।

'পালাবার চিন্তা ভুলেও মনে স্থান দেবেন না।' বলল সিকিউরিটির লোকটা। 'আপনি কি ভেবেছেন এ কথার উত্তর দিতে পারব না?' ডঃ সাহাকে উদ্দেশ করে বলে উঠলেন জাল ডঃ নটরাজন।

'আসল লোক হলে নিশ্চয়ই পারবেন। কারণ এই প্রজেক্টে ব্যবহৃত লেসারের কথা জানি আমি আর আসল ডঃ নটরাজন।' বললেন ডঃ সাহা।

'আমরা কারবন-ডাই-অক্সাইড লেসার ব্যবহার করছি।' জবাব দিলেন ডঃ নটরাজনের নকল।

হো হো করে হেসে উঠলেন ডঃ সাহা, 'করছি না, বলুন করতাম। প্রথম দিকে পরীক্ষা চালাবার সময় আমরা কারবন-ডাই-অক্সাইড লেসার ব্যবহার করতাম ঠিকই। কিন্তু পরে কতকগুলো অসুবিধে দেখা দেওয়াতে আমরা কারবন-ডাই-অক্সাইড লেসারের বদলে ব্যবহার করতে শুরু করি অন্য একটি গ্যাস লেসার। সেই গ্যাস লেসারের নাম আপনি জানেন না নকল ডঃ নটরাজন। তাই আমি যখন সাংবাদিকদের কারবন-ডাই-অক্সাইড লেসারের কথা বলি তখন আপনি বসে থেকেও সেকথার এতটুকু প্রতিবাদ করেন নি।'

নকল ডঃ নটরাজন এবার একেবারে ভেঙে পড়লেন। দুহাতে মুখ ঢাকলেন উনি। সিকিউরিটির লোকেরা ওঁকে বাইরে নিয়ে গেল।

এর পরের ব্যাপার খুবই সংক্ষিপ্ত। ডঃ নটরাজনের একটা ছোট ঘর থেকে উদ্ধার করা হল আসল ডঃ নটরাজনকে। ভদ্রলোক আচ্ছন্নের মত শুয়ে ছিলেন বিছানায়। নকল ডঃ নটরাজনের মুখোশ টেনে খুলে ফেলতেই আসল লোকটিকে চেনা গেল। প্রজেক্টেরই একজন টেকনিসিয়ান, নাম মিঃ শঙ্করণ। দেশে যাবেন বলে এক মাসের ছুটি নিয়েছিলেন। কোন দেশের হয়ে কাজ করছিলেন মিঃ শঙ্করণ তা অবশ্য আমরা জানতে পারিনি। সে খবর দক্ষ সিকিউরিটি অফিসাররা মিঃ শঙ্করণের মুখ থেকে নিশ্চয় টেনে বার করতে পারবেন। ডঃ সাহা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'তোমার বুদ্ধিতেই ভারত সরকারের সম্মান রক্ষা হল জয়ন্ত।'

আমি একটু লজ্জা পেয়ে বললাম 'না, না যা করার তাতো আপনিই করেছেন মাস্টারমশাই, আমি শুধু আপনাকে একটু সাহায্য করেছি।'

আমরা সাংবাদিকরা এখন বহাল তবিয়তে অতিথি-শালায় সময় কাটাচ্ছি। প্রজেক্ট এইচ-এর ডেমনেস্ট্রেশান দেখে তবে দিল্লী ফিরব।

7/4, W2c, Phase II Golf Green, Cal-45

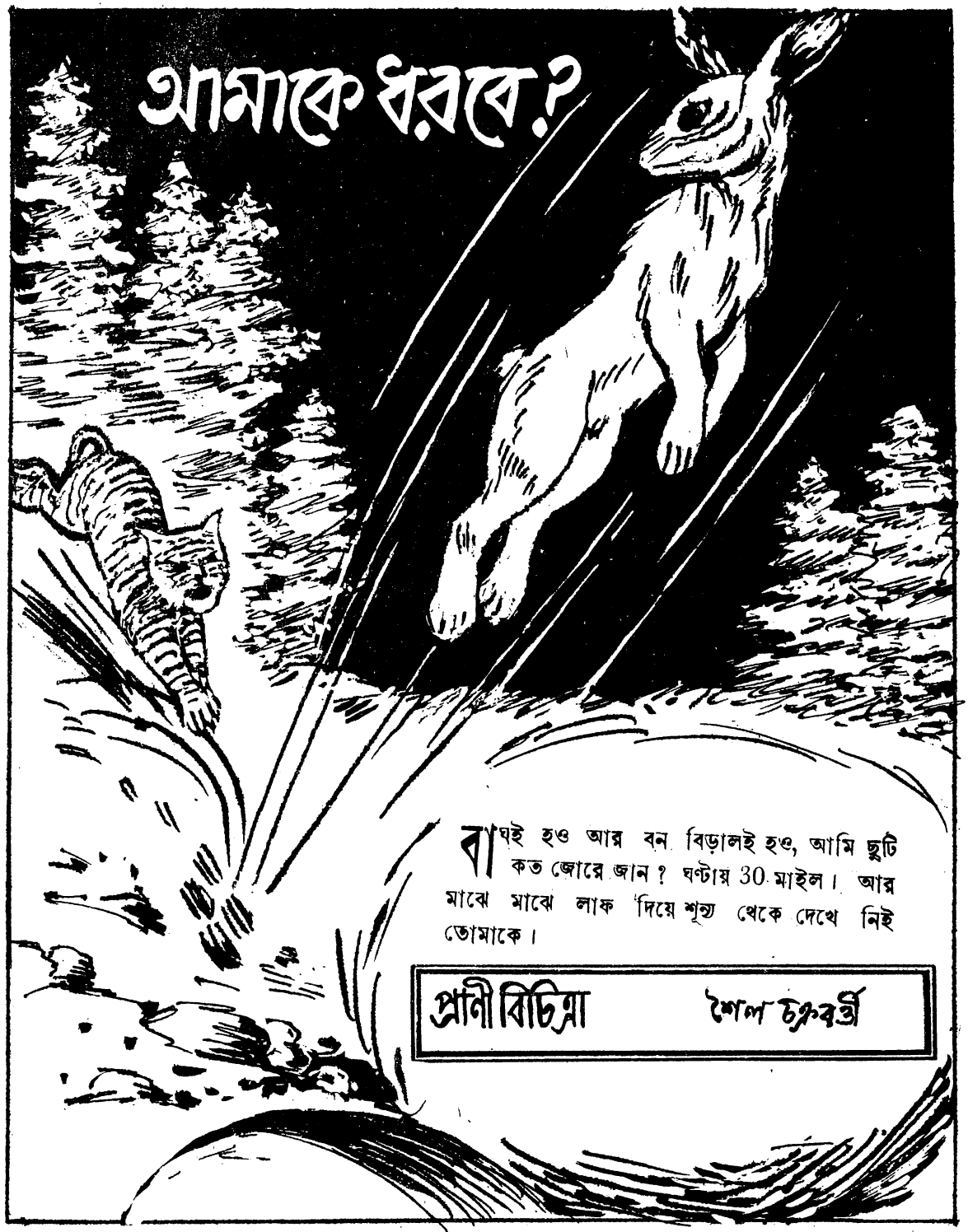
আমাকে ধরবে?
বাঘই হও আর বন বিড়ালই হও, আমি ছুটি কত জোরে জান? ঘণ্টায় 30 মাইল। আর মাঝে মাঝে লাফ দিয়ে শূন্য থেকে দেখে নিই তোমাকে।
প্রাণী বিচিত্রা
শৈল চক্রবর্ত্তী

চেনা-অচেনা জীবজন্তু ঃ

পান্ডা

ছবিতে যে প্রাণীটি দেখতে পাচ্ছ তার নাম 'জায়েন্ট পান্ডা' অর্থাৎ কিনা 'দানব পান্ডা।' লক্ষ্য কর — চেহারায় খানিকটা ভল্লুক ও বেড়ালের আদল আছে। সাধারণ এক একটি পান্ডা লম্বায় প্রায় 22 থেকে 24 ইঞ্চি পর্যন্ত হয়ে থাকে। দেহের তুলনায় লেজটি বেশ লম্বাই বলতে হবে। আর ওজন ?—দশ-বারো পাউন্ড মতো হবে। সাদা মুখটির দু' পাশে লালচে বাদামী রঙের দুটি দাগ থাকে। চোখ দুটি বাদামী রঙের, নাকটি অবশ্য কালো। দেহের উপরকার রং মরচের মতো। পা, বুক ও পেটের তলার রং কালো। লেজটি লালচে-বাদামী রঙের হয় এবং তাতে বলয় চিহ্ন আঁকা থাকে। কান দুটি খাড়া ও ছুঁচলো। পায়ের থাবার তলায় থাকে লোম। পায়ের নখগুলি ধারালো ও বাঁকা। হাঁটে ভল্লুকের ঢংয়ে। ঘুমোয় গাছের কোটরে। রেগে গেলে শত্রুকে কামড়ে দিতে দ্বিধা করে না। বিরক্ত হলে মুখে এক রকম বিচিত্র শব্দ করে। ক্ষিদে পেলে তীক্ষ্ণ ও কর্কশ স্বরে ডাকে। এদের খাদ্য হচ্ছে গাছের শিকড়, দু-এক রকম মোটা পাতাওয়ালা ঘাস, গাছের পাতা, বিশেষ করে কচি বাঁশপাতা, কখনও কখনও অবশ্য ডিম ও পোকা-মাকড়ও খায়। নেপাল, সিকিম, ভুটান, পূর্ব হিমালয়, উত্তর ব্রহ্মদেশ এবং চীনের ইউনাস অঞ্চলে এই প্রাণীরা বাস করে। পান্ডারা সহজেই পোষ মানে কিন্তু। চিড়িয়াখানায় গেলে তোমরা এই বিচিত্র প্রাণীটিকে দেখতে পাবে।

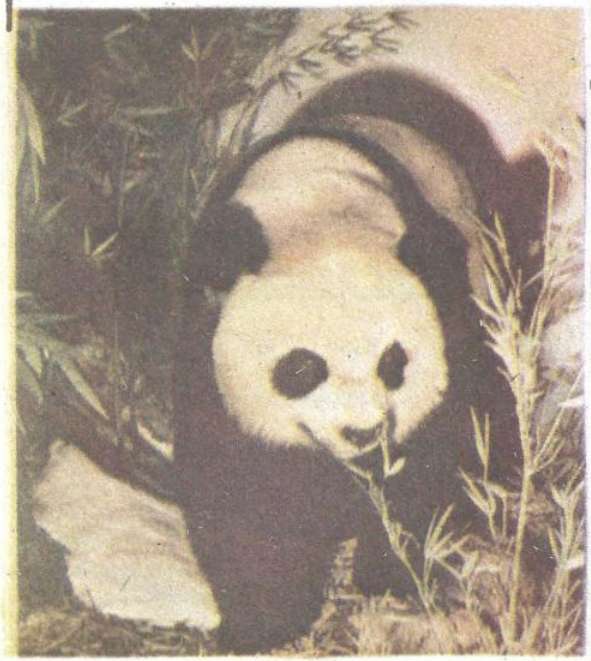

বহুরূপী হচ্ছে গিরগিটি জাতীয় এক আজব প্রাণী ; ইংরেজীতে এর নাম 'ক্যামীলিয়ন'। রঙীন ছবিটি দেখলেই এদের চেহারা কেমন তা বুঝতে পারবে। বাগানে ঝোপঝাড়ে এদের দেখা যায়। প্রাণীটির ঘাড় আছে বলে মনেই হয় না। চারটি ছোট ছোট পা আছে। প্রতিটি পায়ে পাঁচটি করে আঙ্গুল আছে। এরা গাছের উপর চলে ফিরে বেড়ায়। লেজটি নেহাৎ ছোট নয়। সামলাবার জন্যে বহুরূপী লেজটিকে গাছের ডালে জড়িয়ে রাখে। পৃথিবীতে নানা জাতের বহুরূপী আছে। লম্বায় এরা আড়াই ইঞ্চি থেকে দেড়ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে। বহুরূপীরা ডিম পাড়ে এবং পোকামাকড় শিকার করে খায়। দেহের তুলনায় এদের জিভটি বেশ লম্বা। শিকার সহজে ধরার জন্যে ওদের ঐ লম্বা জিভের দরকার হয়। ওরা একটা চোখ স্থির রাখে শিকারের উপর, আর এক চোখ দিয়ে দেখে কাছেপিঠে কোন শত্রু লুকিয়ে আছে কিনা। রেগে গেলে বহুরূপী একবার সামনে ও একবার পিছনে দোলে এবং সেই সঙ্গে হিস হিস শব্দ করে শত্রুকে ভয় দেখায়। মাদাগাস্কার ও আফ্রিকায় মাথায় শিংওয়ালা বহুরূপী দেখা যায়। এরা ভীষণ ঝগড়ুটে আর লড়াই করতে ওস্তাদ। এই প্রাণীরা চোখের নিমেষেই গায়ের রংটা বদলে ফেলতে পারে। যখন বিপদ আসে তখন চারপাশের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে গায়ের রং বদলায়। বহুরূপীর গায়ের চামড়ায় অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষ আছে। কতকগুলি কোষ আবার অতি সূক্ষ্ম রেণুতে ভরা। রেণুগুলির উপর সূর্যের আলো পড়লে সে আলো প্রতিফলিত হয়ে সাদা রঙের সৃষ্টি করে। অন্যান্য কোষগুলি বাদামী বা লালচে রঙের রঞ্জক পদার্থে ভরা। ভয় পেয়ে প্রাণীটি যখন গায়ের চামড়া কোঁচকায় তখন ঐ রঞ্জক পদার্থগুলি চামড়ার উপরদিকে আসে। তখন বহুরূপীকে কালো দেখায়। রঞ্জক পদার্থ যখন চামড়ার একটু নিচে থাকে তখন বহুরূপীর রং হয় সবুজ। আর যেখানে রঞ্জক পদার্থ আদৌ থাকে না, চামড়ার সে জায়গার রং হয় হলদে। আশা করি এবার এই প্রাণীটিকে চিনে নিতে তোমাদের অসুবিধা হবে না।

কিউই

যে পাখির রঙীন ছবিটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ, সে পাখি কিন্তু আমাদের দেশে পাওয়া যায় না। একমাত্র নিউজিল্যান্ড ছাড়া বিশ্বের আর কোথাও তোমরা এদের দেখতে পাবে না। এ পাখির নাম কিউই। কিউই এর ডানা খুবই ছোট, লেজ নেই। এদের সারা শরীর পালকে ঢাকা। এ পালকগুলি কিন্তু অন্যান্য পাখিদের পালকের মত নয়। কিউই পাখি বটে, তবে মোটেই উড়তে পারে না। কারণ আকাশে উড়বার মত শক্তিশালী ডানা এদের নেই। তবে উড়তে না পারলেও কিউই পাখি ছুটতে পারে খুব। এদের পায়ে চারটি আঙ্গুল থাকে। আঙ্গুল সমেত পায়ের গড়ন বেশ মজবুত। ভয় পেলে শত্রুকে আক্রমণ করার মত হাতিয়ার নেই কিউই পাখির। তাই আক্রান্ত হলে তাড়াতাড়ি দৌড়ে পালানো ছাড়া আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই কিউই পাখির। দেহের তুলনায় কিউইয়ের ঠোঁটটি বেশ লম্বা এবং সামান্য বাঁকানো। নাকে ছিদ্র আছে, তবে সে ছিদ্র প্রায় ঠোঁটের আগায়—আর সব পাখিদের মত ঠোঁটের গোড়ার দিকে নয়। এদের প্রধান খাদ্য হলো কেঁচো। ছাড়াও এরা নানারকম পোকামাকড় ও তাদের ডিম খায়। বনের ফল ও গাছের পাতাও খেতে বাদ দেয় না। কিউই নির্জন, অন্ধকার বন-জঙ্গলে থাকতে ভালবাসে। পুরুষ পাখি ডাকে 'কি-উই' স্বরে তাই নাম হয়েছে 'কিউই'। স্ত্রী কিউই ডিম পাড়ে। বেশ বড়সড় ডিম। আর পুরুষের চেয়ে স্ত্রী-কিউই আয়তনে বেশ বড় হয়। খাঁচায় রেখে তবে উপযুক্ত পরিবেশে এ হেন পাখিকে ও কিন্তু পোষ মানানো যায়।

জেব্রা

চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়ে তোমরা অনেকেই 'জেব্রা' নামক সুন্দর প্রাণীটিকে দেখে থাকবে। এরা

আফ্রিকার অধিবাসী। জেব্রার কান দুটি গাধার মত আর পা চারখানি ঘোড়ার মত। সারা গায়ে কালো ও সাদা রঙের ডোরা কাটা দাগ। শরীরের এই দাগকে জেব্রা আত্মগোপনের কাজে লাগায়। বনের মধ্যে আলো আঁধারের মাঝে জেব্রা যখন চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে তখন দূর থেকে তাকে চেনা দায় হয়। পরিবেশের রঙের সঙ্গে তার দেহের রঙ এমনভাবে মিশে থাকে যে তা ধরা শক্ত। জেব্রারা একা একা চরতে ভয় পায়। তাই দলবেঁধে চরে। সিংহকে ওরা সবচেয়ে বেশি ভয় পায়, কারণ সিংহের কাছে জেব্রার মাংস অতি প্রিয় খাদ্য। এই প্রাণীদের দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি অতি প্রখর। প্রবল এদের ঘ্রাণশক্তি। ওরা খুব জোরে দৌড়াতে পারে। এদের পায়ে খুর আছে, যেমনটি থাকে ঘোড়ার পায়ে। পায়ের এই খুরগুলি ওদের আত্ম-রক্ষার হাতিয়ার। তবে এই সামান্য হাতিয়ার নিয়ে বাঘ, সিংহ প্রভৃতি দুর্দান্ত শত্রুদের সঙ্গে যোঝা যায় না। তাই কোনও অসতর্ক মুহূর্তে, বিশেষ করে জলাশয়ে জল পানের সময় আড়ালে লুকিয়ে থাকা বাঘ বা সিংহ এদের ঘাড়ে অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ে এদের হত্যা করে। প্রাণ যায় জেব্রার। এমনিভাবে প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুদের কবলে পড়ে প্রতি বছরই এই সুন্দর প্রাণীদের অনেকেই অকালে প্রাণ হারায়।

অমরনাথ রায়

জুনিয়র
ক্যুইজ কনটেস্ট

অক্টোঃ-নভেঃ 1986

মান ঃ VI/VII/VIII

1. স্পঞ্জের গায়ে অসংখ্য ছিদ্র আছে। ঐ ছিদ্রগুলির নাম কি ?
2. কোন্ কলার মাধ্যমে পাতায় প্রস্তুত খাদ্যের দ্রবণ উদ্ভিদের দেহের বিভিন্ন অংশে পরিবাহিত হয় ?
3. ম্যাসিডনের রাজা ফিলিপ-এর পুত্রের নাম কি ছিল ?
4. কোন্ দেবীর নামানুসারে শুক্রবারের নাম রাখা হয়েছে 'ফ্রাই-ডে' ?
5. বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ 'ডেকামেরন' এর রচয়িতা কে ?
6. কত খ্রিস্টাব্দে কোন্ দেশ মহাকাশে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে ?
7. 'রামানুজন' কে ছিলেন ?
8. অণু ও পরমাণুর মধ্যে কোনটি ছোট ?
9. কোন্ কোন্ ধাতু হাইড্রোজেন গ্যাস শোষণ করতে পারে ?
10. আল্পস পর্বতমালা কোন্ দেশে অবস্থিত ?
11. ভারতের প্রথম ফুটবল ক্লাব কোন্‌টি ?

আগস্ট/86 'জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট'-এর সমাধান

1. নেই।
2. উদ্ভিদের মূল অথবা কাণ্ডের ডগার দিকে থাকে।
3. মিশরীয়রা।
4. শূদ্রক।
5. ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতি।
6. ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল।
7. কার্বন ডাই সালফাইড নামক তরলে।
8. কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন।
9. ইউরি গ্যাগারিন।
10. পূর্ব গোলার্ধে।
11. 64টি।
12. ফোটো ক্যুইজের সমাধান ঃ
    ফার গাছ

জুনিয়র
ফটো ক্যুইজ

12. নিচের ছবিটা তোমাদের চেনা উচিৎ। আগে প্রতি ঘরেই এই ঘড়ি ব্যবহার করা হত। এবং ঘড়িটার একটা বিশেষ নামও আছে। তুমি বলতে পারবে ?

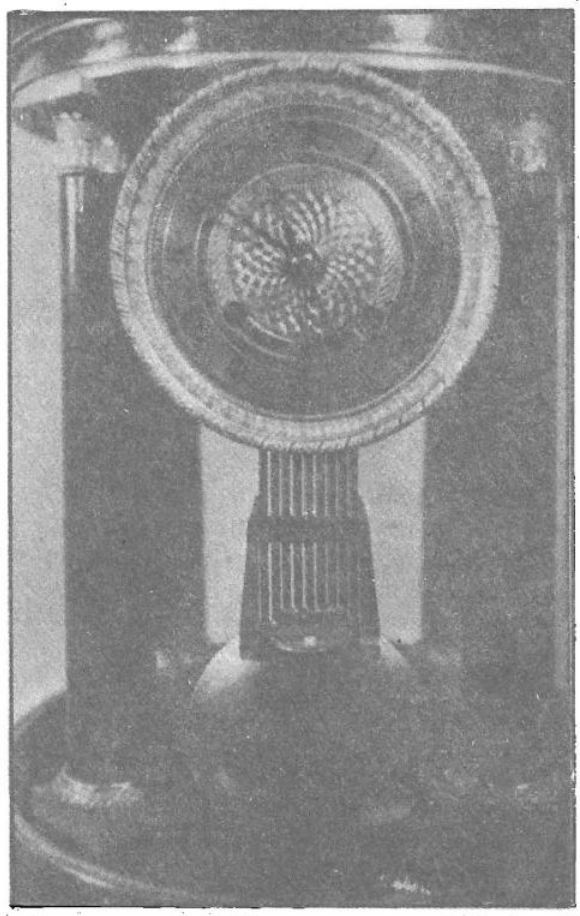

সিনিয়র/জুনিয়ার ক্যুইজ কনটেস্ট, আইকিউ টেস্ট, এবং ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তরের সঙ্গে এই কুপনটি কেটে পাঠাতে হবে।

আমি .....

বয়স ..... শ্রেণী.....

বিদ্যালয়ের নাম .....

আই কিউ টেস্ট/সিনিয়র/জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট ফোটো ক্যুইজ-এর উত্তর পাঠালাম।

ল. সা. গু. প্রসঙ্গে

অসীম মুখোপাধ্যায়

নিবন্ধে ব্যবহৃত সংখ্যাগুলি সবই ধনাত্মক পূর্ণসংখ্যা। দুই বা অধিক সংখ্যক সংখ্যার লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ল. সা. গু. বলতে এমন একটি সংখ্যা বোঝায় যেটি (ক) সংখ্যাগুলির প্রত্যেকটি দ্বারা বিভাজ্য এবং (খ) যেটির থেকে ছোট কোনো সংখ্যা থাকবে না যা সংখ্যাগুলির দ্বারা বিভাজ্য হবে।

একটি সংখ্যা ক অপর একটি সংখ্যা খ ($\leq$ক) দ্বারা বিভাজ্য—এর অর্থ হলো যে এমন একটি সংখ্যা গ থাকবে যাতে ক=খ×গ হবে।

দুই বা অধিক সংখ্যক সংখ্যাকে পরস্পর মৌলিক আখ্যা দেওয়া হয় যখন তাদের মধ্যে কোনো সাধারণ উৎপাদক থাকে না। একটি সংখ্যাকে মৌলিক বলা হয় যদি এটিকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করা না যায়, এক্ষেত্রে উৎপাদক হিসেবে 1 সংখ্যাটিকে গ্রাহ্য করা হচ্ছে না।

উপপাদ্য 1. কতিপয় একই সংখ্যার ল. সা. গু. সেই একই সংখ্যা।

প্রমাণ ঃ মনে করি ক, ক এবং ক ইত্যাদি কয়েকটি একই সংখ্যা, প্রমাণ করতে হবে যে এদের ল. সা. গু=ক ; এখানে লক্ষণীয় যে ক সংখ্যাটি প্রতিটি সংখ্যা ক দ্বারা বিভাজ্য এবং ক-এর থেকে ছোট কোনো সংখ্যা নেই যা ক দ্বারা বিভাজ্য হবে। অতএব ল. সা. গু-র সংজ্ঞানুসারে সংখ্যাগুলির ল. সা. গু হবে ক।

উপপাদ্য 2. পরস্পর মৌলিক সংখ্যাসমূহের ল. সা. গু সেই সংখ্যাগুলির গুণফল।

প্রমাণ ঃ মনে করি ক, খ, গ তিনটি পরস্পর মৌলিক সংখ্যা। এই তিনটি সংখ্যার গুণফল ক×খ×গ প্রতিটি সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য। গুণফলটি ল. সা. গু. না হলে এর থেকে ছোট এমন একটি সংখ্যা 'ল' থাকবে যেটি প্রতিটি সংখ্যা দ্বারা বিভাজ্য হবে।

ল সংখ্যাটি ক দ্বারা বিভাজ্য বলে, ল=ক×চ ; আবার ল(=ক×চ) খ দ্বারা বিভাজ্য বলে ল=খ×ছ

$\therefore$ ক×চ=খ×ছ, বা ছ=ক×চ÷খ

এখন ক এবং খ পরস্পর মৌলিক, সুতরাং চ অবশ্যই খ দ্বারা বিভাজ্য হবে, অতএব চ=খ×জ এবং

ল=ক×খ×জ

কল্পনানুসারে ল<ক×খ×গ

বা, ক×খ×জ<ক×খ×গ

বা, জ<গ.

পরিশেষে, ক, খ এবং গ পরস্পর মৌলিক এবং ল(=ক×খ×জ) গ দ্বারা বিভাজ্য অর্থাৎ জ গ দ্বারা বিভাজ্য ; কিন্তু তা সম্ভব নয় কারণ পূর্বেই দেখানো হয়েছে যে জ<গ।

সুতরাং ক×খ×গ-এর থেকে ছোট কোনো সংখ্যা নেই যেটি ক, খ এবং গ প্রভৃতি দ্বারা পৃথকভাবে বিভাজ্য হবে। ল. সা. গু-র সংজ্ঞানুসারে ক, খ এবং গ-এর ল. সা. গু=ক×খ×গ।

দুই বা অধিক সংখ্যক পরস্পর অমৌলিক সংখ্যার ল. সা. গু. নির্ণয়ের সমস্যায় আসা যাক। প্রথমে সংখ্যাগুলিকে ঘাতসহ মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে। বৃহত্তম ঘাতবিশিষ্ট প্রতিটি উৎপাদকের গুণফল হবে সংখ্যাগুলির ল. সা. গু। একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ ঃ 22, 88, 132 এবং 198 সংখ্যাগুলির ল. সা. গু. নির্ণয় কর।

সমাধান—প্রথম ধাপ ঃ সংখ্যাগুলির ঘাতসহ মৌলিক উৎপাদকে বিশ্লেষণ—

$22=2\times11$, $88=2^3\times11$, $132=2^2\times3\times11$, $198=2\times3^2\times11$.

দ্বিতীয় ধাপ ঃ উচ্চ ঘাত বিশিষ্ট মৌলিক উৎপাদকগুলির তালিকা—2^3, 3^2, 11.

তৃতীয় ধাপ ঃ দ্বিতীয় ধাপে প্রাপ্ত উৎপাদকগুলির গুণফল—$2^3\times3^2\times11=792$.

চতুর্থ ধাপ ঃ নির্ণেয় ল. সা. গু.—তৃতীয় ধাপের গুণফল=792.

স্পষ্ট যে এইভাবে প্রাপ্ত সংখ্যাটি প্রদত্ত প্রতিটি সংখ্যা দ্বারা অবশ্যই বিভাজ্য এবং সেই সঙ্গে এটি ক্ষুদ্রতম সাধারণ গুণিতক কারণ কোনো একটি মৌলিক উৎপাদকের ঘাত কম হলে, গুণফলটি অন্ততঃ একটি সংখ্যাদ্বারা আর বিভাজ্য হবে না।

এখন উপরিউক্ত উদাহরণের দ্বিতীয় ধাপের উচ্চ ঘাত বিশিষ্ট মৌলিক উৎপাদকগুলিকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করে লেখা হবে—

প্রথম খণ্ডে থাকবে উচ্চ ঘাত সহ সেই সব মৌলিক উৎপাদক যেগুলি অন্ততঃ দুটি সংখ্যার মধ্যে সাধারণ উৎপাদক হিসেবে বিদ্যমান, অর্থাৎ {2^2, 3, 11} বা {2, 2, 3, 11} ;

এবং দ্বিতীয় খণ্ডে থাকবে বাকি উৎপাদক সমূহ যথা {2, 3}

বলা বাহুল্য, উপরিউক্ত খণ্ড দুটির সংখ্যাসমূহের গুণফল নির্ণেয় ল. সা. গু. 792.

এইভাবে দ্বিতীয় ধাপের সংখ্যাগুলিকে দুটি খণ্ডে বিভক্ত করার প্রক্রিয়াটি উপস্থাপন করার উদ্দেশ্য হলো— ল. সা. গু. নির্ণয়ের জন্য যে প্রচলিত পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে তারই একটা গাণিতিক যৌক্তিকতা তুলে ধরা।

এখন উদাহরণের অঙ্কটি প্রচলিত নিয়মে করা যাক।

2 | 22, 88, 132, 198
2 | 11, 44, 66, 99
3 | 11, 22, 33, 99
11 | 11, 2, 11, 33
1, 2, 1, 3

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে ওপরের ছকের স্তম্ভের সংখ্যাগুলি আলোচ্য প্রথম খণ্ডের সংখ্যা এবং 1 ব্যতীত শেষ সারির সংখ্যাগুলি দ্বিতীয় খণ্ডের সংখ্যাসমূহ। প্রচলিত নিয়মে স্তম্ভের এবং শেষ সারির সংখ্যাগুলি গুণ করলে পূর্ববর্ণিত দুটি খণ্ডের সংখ্যাগুলির গুণফল পাওয়া যাবে যা অবশ্যই প্রদত্ত সংখ্যাগুলির উচ্চ ঘাত বিশিষ্ট মৌলিক উৎপাদকগুলির গুণফল এবং সংজ্ঞানুসারে এটি নির্ণেয় ল. সা. গু.।

একটি বিষয় লক্ষ্য করার আছে, প্রচলিত নিয়মে অসম্পূর্ণ স্তম্ভ এবং তদ্‌সংশ্লিষ্ট সারির সংখ্যাগুলির গুণফল প্রদত্ত প্রতিটি সংখ্যাদ্বারা বিভাজ্য কিন্তু গুণফলটি ল. সা. গু. নয়। স্তম্ভ বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উক্ত গুণফলটি ছোট হতে থাকে এবং স্তম্ভ সম্পূর্ণ হলে ঐ গুণফলটি ল. সা. গু. তে পরিণত হয়।

তিন বা অধিক সংখ্যক সংখ্যার গ. সা. গু. নির্ণয়ের জন্য যে প্রচলিত পদ্ধতি (দুটি করে সংখ্যা নিয়ে) আছে, তিন বা অধিক সংখ্যক সংখ্যার ল. সা. গু. নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনুরূপ নিয়ম গ্রহণ করা যেতে পারে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা করা হয় না কারণ এটি সময় এবং শ্রমসাপেক্ষ এবং তা ছাড়া প্রচলিত নিয়মে সব কটি প্রদত্ত সংখ্যা নিয়ে একযোগে অগ্রসর হওয়ার অপূর্ব সুযোগ আছে।

প্রচলিত নিয়মে ল. সা. গু. নির্ণয়ের সময় একটি বিষয়ের ওপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার, সেটি হলো— সারির সংখ্যাগুলি থেকে নিষ্ক্রান্ত উৎপাদকগুলি যেন মৌলিক হয়; তা না হলে প্রাপ্ত ল. সা. গু. ভুল হবার সম্ভাবনা থাকে। একটি উদাহরণ নেওয়া যেতে পারে।

উদাহরণ 7, 9, 21, 63 সংখ্যাগুলির ল. সা. গু. নির্ণয় কর।

কেউ যদি অঙ্কটি এইভাবে করে

9 | 7, 9, 21, 63
7 | 7, 1, 21, 7
1, 1, 3, 1

∴ ল. সা. গু. $= 9 \times 7 \times 3 = 189$. তবে তার সমাধানটি ভুল হবে, কারণ স্তম্ভের প্রথম সংখ্যা 9 মৌলিক নয় এবং এর একটি উৎপাদক 3, 21 সংখ্যাটির উৎপাদক। এর অর্থ এই নয় যে অমৌলিক সংখ্যা সাধারণ উৎপাদক হিসেবে কখনই সারি থেকে নিষ্ক্রান্ত করা যাবে না; অমৌলিক সংখ্যা সারি থেকে নিষ্ক্রান্ত করা যাবে যখন এর কোনো উৎপাদক সারির অপরিবর্তিত কোনো সংখ্যার মধ্যে উৎপাদক হিসেবে থাকবে না। বলাবাহুল্য, কেবলমাত্র মৌলিক সংখ্যা নিষ্ক্রান্ত হলে স্তম্ভটি দীর্ঘকায় হয়।

উদাহরণটির সঠিক সমাধান হবে—

3 | 7, 9, 21, 63
3 | 1, 3, 7, 21
7 | 1, 1, 7, 7
1, 1, 1, 1

নির্ণেয় ল. সা. গু. $= 3 \times 3 \times 7 = 63$.

যে ধরনের সমস্যাদিতে ল. সা. গু.-র প্রয়োজন পড়ে সেগুলির একটি তালিকা উপসংহারে দেওয়া হচ্ছে—

(ক) একযোগে কতকগুলি ঘটনা শুরু হয়ে বিভিন্ন সময়ান্তরে সেইগুলি ঘটতে থাকলে ন্যূনপক্ষে কখন সেগুলি পুনরায় একত্র ঘটবে।

(খ) কতকগুলি সংখ্যাদ্বারা বিভাজ্য ও ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয়ে

(গ) কতকগুলি সংখ্যাদ্বারা বিভাজ্য এবং কোনো বিশেষ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম বা বৃহত্তম সংখ্যা নির্ণয়ে।

(ঘ) কতকগুলি সংখ্যাদ্বারা ভাগ করলে প্রতিক্ষেত্রে একই বা বিভিন্ন ভাগশেষ থাকে এমন ক্ষুদ্রতম সংখ্যা নির্ণয়ে

(ঙ) কতকগুলি সংখ্যাদ্বারা বিভাজ্য এবং কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যার ঠিক পূর্ববর্তী বা পরবর্তী সংখ্যা নির্ণয়ে

(চ) দুটি সংখ্যার গুণফল থেকে গ. সা. গু. নির্ণয়ে।

28/4/2/1B, শ্রীমোহন লেন, কলি-26।

প্রাণিকলা ঃ তরুণাস্থি, অস্থি ও রক্ত

দিনোজ কুমার দে

প্রাণীদের দেহে দুই প্রকার কঙ্কালতন্ত্র দেখা যায়। বহিঃকঙ্কাল ও অন্তঃকঙ্কাল। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র বহিঃকঙ্কাল থাকে কিন্তু মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে বহিঃকঙ্কাল ও অন্তঃকঙ্কাল উভয়-প্রকার কঙ্কালতন্ত্রই দেখা যায় এবং মেরুদণ্ডী প্রাণীদের দেহের ওজনের $\frac{1}{7}$ অংশই কঙ্কাল। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের বহিঃকঙ্কাল যেমন নখ, কেশ ইত্যাদি যেগুলি আবরণী কলা দ্বারা গঠিত। আর অন্তঃকঙ্কাল তরুণাস্থি, অস্থি প্রভৃতি যোগ-কলার সমন্বয়ে গঠিত।

তরুণাস্থি একপ্রকার স্থিতিস্থাপক ভারবাহী কলা। স্থিতিস্থাপক বলার কারণ এই কলা বেশ চাপ ও টান সহ্য করতে পারে। তরুণাস্থি কলা কনড্রিন (Chondrin) নামক ধাত্র ও তরুণাস্থি কোষ কনড্রোসাইট নিয়ে গঠিত। পেরিকনড্রিয়াম নামক একটি তন্তুময় যোগকলা দ্বারা তরুণাস্থি কলা আবৃত থাকে। ধাত্র কনড্রিনের উপর নির্ভর করে এই কলাকে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা হায়ালিন তরুণাস্থি, শ্বেত-তন্তু-ময় তরুণাস্থি ও স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থি। হায়ালিন তরুণাস্থিকে স্বচ্ছ-তরুণাস্থিও বলে। এই তরুণাস্থিতে কোলাজেন শ্বেত-তন্তু দেখা যায়। এই কোলাজেন শ্বেত-তন্তুর ও ধাত্রের প্রতিসরণমান এক হওয়ায় উভয়কে আলাদা আলাদা দেখা যায় না। এই কারণে এই কলাকে মোটামুটি স্বচ্ছ দেখা যায়। এই হায়ালিন তরুণাস্থি পেরিকনড্রিয়াম দ্বারা সম্পূর্ণ-রূপে আবৃত থাকে। এই কলা পাঁজর, নাসিকা প্রভৃতি স্থানে দেখা যায়। তরুণাস্থিযুক্ত মাছ যেমন হাঙর, রে প্রভৃতি পরিণত মাছের কঙ্কালতন্ত্র গঠন করে এই কলা। শ্বেততন্তুময় তরুণাস্থি কলায় শ্বেত-তন্তু গুচ্ছাকারে থাকে। তাছাড়া এই কলায় পেরিকনড্রিয়াম অবর্তমান। এই কলা দুইটি অস্থির সংযোগস্থলে দেখা যায়। ফলে অস্থি দুইটির ঘর্ষণজনিত ক্ষয় বোধ হয়। চোয়াল ও জানুর সন্ধিতে এই কলা দেখা যায়। স্থিতিস্থাপক তরুণাস্থিতে যে পীততন্তুগুলি থাকে সেগুলি পরস্পর-যুক্ত হয়ে জালের মত সৃষ্টি করে। এই জালের ফাঁকে ফাঁকে তরুণাস্থির কোষগুলি থাকে। মানুষের কর্ণছত্রে, আলজিবে, স্বরযন্ত্রে এই কলা দেখা যায়। এই কলা কোন বিশেষ অঙ্গের কাঠামো গঠন করে এবং দৃঢ়তা প্রদান করে।

অস্থি কলা দেহের সবচেয়ে কঠিন যোগকলা অথচ এই কলা প্রচণ্ডরকম ভঙ্গুর। এই কলাও ধাত্র ও অস্থিকোষের সমন্বয়ে গঠিত। এর ধাত্র ক্যালসিয়াম ফসফেট ও ক্যালসিয়াম কার্বনেট নামক অজৈব পদার্থ এবং কোলাজেন নামক জৈব পদার্থ দ্বারা গঠিত। অস্থিকলায় অস্টিও-ব্লাস্ট, অস্টিওক্লাস্ট ও অস্টিওসাইট নামক তিন ধরনের অস্থিকোষ বর্তমান। অস্থিকলায় ধাত্র বৃত্তাকার স্তরে সজ্জিত থাকে। এক একটা স্তরকে বলে ল্যামেলা। ল্যামেলাতে অথবা দুটি ল্যামেলার মধ্যবর্তী স্থানে ছোট ছোট গহ্বর দেখা যায়। গহ্বরগুলিকে বলা হয় ল্যাকুনা। ল্যাকুনাগুলি ক্যানালিকিউলি নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নালিকা দ্বারা যুক্ত। ল্যামেলাগুলির কেন্দ্রস্থলে একটি বড় নালী দেখা যায়। বড় নালীটিকে বলে হ্যাভারিয়ান নালী। ল্যামেলাগুলি ও হ্যাভারসিয়ান নালী একত্রে তৈরি করে হ্যাভারসিয়ান-তন্ত্র। অস্থি-কলায় অস্থি কোষগুলি দেখা যায় ল্যাকুনার মধ্যে। এই কলা পেরিঅস্টিয়াম নামক যোগকলার আবরণ দ্বারা আবৃত থাকে। এই কলা দেহের অন্তঃকঙ্কাল গঠন করে এবং দেহের সব স্থানেই দেখা যায়। অস্থিকলার প্রধান কাজ দেহের কাঠামো গঠন করা এবং ভার বহন করা। এই কলা আমাদের শরীরের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গকে যেমন মস্তিষ্ক, সুষুম্নাশীর্ষ, ফুসফুস প্রভৃতিকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে। অস্থিকলার সাহায্যেই আমাদের বিভিন্ন অঙ্গের সঞ্চালন সম্ভব হয়ে থাকে।

যে কলা আমাদের দেহের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তাকে বলে রক্ত। অর্থাৎ রক্ত হল আমাদের দেহে সঞ্চারণশীল তরল যোগকলা। লসিকাও আবার একটি তরল যোগকলা। রক্ত দুটি উপাদানে গঠিত। রক্তের ক্ষারধর্মী, হলুদ রঙের তরল ধাত্রকে বলে রক্তরস বা প্লাজমা। এই প্লাজমা বা রক্তরসের মধ্যে রক্ত কণিকাগুলি ভাসমান অবস্থায় থাকে। রক্তের মোট আয়তনের শতকরা 55 ভাগ রক্তরস আর শতকরা 45 ভাগ রক্ত কণিকা। রক্তে লৌহঘটিত একপ্রকার শ্বাসরঞ্জক (Respiratory Pigment) হিমোগ্লোবিন থাকার জন্য রক্তকে আমরা লাল দেখি। কিন্তু আরশোলা প্রভৃতি প্রাণীর রক্তে হিমোগ্লোবিন না থাকায় ঐ সমস্ত প্রাণীর রক্তের রঙ সাদা। রক্তরস জল ও বিভিন্ন প্রকার প্রোটিন, গ্লুকোজ, কোলেস্টেরল নামক জৈব উপাদান এবং ক্যালসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতি অজৈব উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। রক্তরসের কাজ দ্রবীভূত অবস্থায় বিভিন্ন প্রকার খাদ্যবস্তু, রেচন-

পদার্থ, হর্মোন প্রভৃতিকে স্থানান্তরে নিয়ে-যাওয়া। রক্ত-রসের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় লোহিতকণিকা, শ্বেত-কণিকা ও অণুচক্রিকা নামক তিন প্রকার রক্তকণিকা বর্তমান। অবশ্য অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র একপ্রকার রক্তকণিকা দেখা যায়। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে সবার লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে না। যেমন মৎস্য, উভচর, সরীসৃপ ও পক্ষী শ্রেণীর প্রাণীদের লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস থাকে। তবে মানুষ ও অন্যান্য স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পরিণত লোহিত কণিকায় নিউক্লিয়াস দেখা যায় না। এই রক্ত কণিকাগুলির উৎপত্তিস্থল অস্থিমজ্জা। এবং এরা মাত্র 120 দিন বাঁচে। এই স্বল্প আয়ুর জন্য এরা প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 15 লক্ষের মত সৃষ্টি হয়। অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড পরিবহণ করাই লোহিতকণিকার প্রধান কার্য। শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবং রক্তে অম্ল ও ক্ষারের অনুপাত রক্ষাতেও লোহিত কণিকার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। রক্তের মধ্যে বর্ণহীন ভাসমান রক্তকণিকাগুলিকে বলা হয় শ্বেত-কণিকা। শ্বেতকণিকার কোষে হিমোগ্লোবিন থাকে না। এরা লোহিত-কণিকার তুলনায় আয়তনে বড় কিন্তু সংখ্যায় কম। শ্বেতকণিকার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এরা অ্যামিবার মত ক্ষণপদযুক্ত। শ্বেতকণিকার সাইটোপ্লাজমের দানার উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি অনুসারে গ্রানুলোসাইট ও আগ্রানুলোসাইট এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্রানুলোসাইট শ্বেতকণিকার সাইটোপ্লাজম অংশে দানা দেখা যায়। এই প্রকার শ্বেতকণিকা নিউট্রোফিল, ইয়োসিনোফিল ও বেসোফিল এই তিন অংশে বিভক্ত। আগ্রানুলোসাইট শ্বেতকণিকার সাইটোপ্লাজম অংশে কোন দানা দেখা যায় না। এরা আবার দুই অংশে বিভক্ত। যথা লিম্ফোসাইট ও মনোসাইট। শ্বেতকণিকার উৎপত্তিস্থল অস্থিমজ্জা, প্লীহা ও লসিকাপর্ব। শ্বেতকণিকা মোটামুটি 12-15 দিন বাঁচে। শ্বেতকণিকার নানাবিধ কাজের মধ্যে প্রধান কাজ হল রক্তে অনুপ্রবেশকারী জীবাণুকে ধ্বংস করা। এছাড়া শ্বেতকণিকার বেসোফিল হেপারিন নামক একপ্রকার প্রোটিন নিঃসৃত করে রক্তনালীর মধ্যে রক্তকে জমাট বাঁধতে দেয় না।

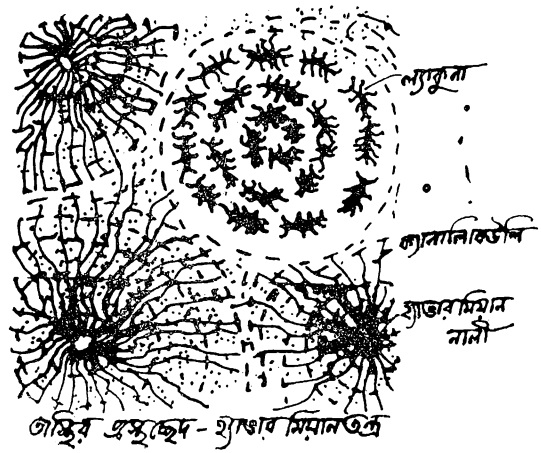

অস্থির প্রস্থচ্ছেদ - হ্যাভারসিয়ান তন্ত্র

প্লাজমার মধ্যে ভাসমান সবচেয়ে ক্ষুদ্র, নিউক্লিয়াস বিহীন রক্ততঞ্চনে সাহায্যকারী রক্তকণিকাগুলিকে বলা হয় অনুচক্রিকা। অনুচক্রিকা 2-3 দিন বাঁচে। কোন স্থান হতে রক্তপাত শুরু হলে সেই স্থানের রক্তকে জমাট বাঁধিয়ে দেওয়াই অনুচক্রিকার প্রধান কাজ।

লোহিতকণিকা, দানাদার শ্বেতকণিকাও অনুচক্রিকা উৎপাদনে সাহায্য করে যে কলা তাকে বলে মিয়েলয়েড কলা (Myeloid tissue)। এই ধরনের কলা আমাদের দেহের বড় বড় অস্থিগুলির গহ্বরে অস্থিমজ্জা রূপে অবস্থান করে।

ধাঁধার উত্তর

উত্তর : একটু অঙ্ক কষেই কিন্তু উপস্থিত সদস্য সংখ্যা বের করা যায়। ধরা যাক, উপস্থিত সদস্যের সংখ্যা x। প্রত্যেক সদস্য $(x-1)$ সদস্যের সঙ্গে করমর্দনের সুযোগ পাবে। এ থেকে অবশ্য তোমাদের মনে হতে পারে যে, x সংখ্যক সদস্যের মধ্যে মোট করমর্দন সংখ্যা হবে $x(x-1)$। আসলে কিন্তু করমর্দনের সংখ্যা হবে $\frac{1}{2}x(x-1)$, কারণ প্রতিটি করমর্দনই হয় দু'জন সদস্যের মধ্যে।

প্রশ্নের শর্তানুসারে, $\frac{1}{2}x(x-1)=78$

বা, $x^2-x-156=0$

বা, $x^2-13x+12x-156=0$

বা, $x(x-13)+12(x-13)=0$

বা, $(x-13)(x+12)=0$

এ থেকে x-এর মান পাওয়া যাচ্ছে 13 বা -12. কিন্তু সদস্য সংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মিটিং-এ তেরো জন সদস্য উপস্থিত ছিল।

বিশেষ রচনা

সমুদ্রকে বাঁচাও

সুবীর দত্ত

'কোপানীকা মাল, দরিয়া মে ডাল'। অর্থাৎ, 'দরিয়া'-তে ফেললেই ঝামেলা শেষ। কিছুদিন আগে পর্যন্তও মানুষের ধারণা ছিল যে সমুদ্রে যা ইচ্ছে ফেলে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে থাকা যায়। এবং ভুলে থাকা যায়।

যুগ যুগ ধরে মানুষের দৃষ্টির বাইরে আবর্জনা সমুদ্রে জমা হচ্ছে। রাইন নদী এসে পড়েছে 'নর্থ সী'-তে। তার 800 মাইল চলার পথে জমা পড়ে নিষ্কাশনী ও শিল্পজাত আবর্জনা। এক হিসেবে জানা গিয়েছে এই ময়লার পরিমাণ রাইন থেকে সমুদ্রে জমা হওয়া মোট জলের পরিমাণের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। ভারতের দুই পবিত্র নদী গঙ্গা ও যমুনাও ভীষণভাবে দূষিত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসীদের দ্বারা তৈরি রাসায়নিক গ্যাসে ভর্তি 62,000 টন ওজনের পাত্র মিত্রশক্তি আটক করে। বৃটিশ ও মার্কিন অফিসাররা সেগুলিকে বাল্টিক সাগরের নিচে ফেলে দেন। ডেনমার্কের জনৈক মন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন···'পাত্রগুলি ক্ষয় হবার পর গ্যাস বেরিয়ে যে কী কাণ্ড করবে ভাবা যায় না।'

বিখ্যাত নরওয়েবাসী অভিযাত্রী থর হেয়ারডেল্, যিনি প্যাপিরাসের নৌকোতে আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন, সমুদ্রের মাঝখানে প্রায় 1400 মাইল ব্যাপী ভাসমান তেলের জমাট টুকরো দেখে আঁৎকে উঠেছিলেন। জল এ্যাতোটা দুর্গন্ধযুক্ত হয়েছিল যে, তাঁর নাবিকরা সাঁতারই কাটতে পারেননি!

'সভ্য' দেশগুলি চিন্তাহীন ভাবে যুগ যুগ ধরে সমুদ্রের বুকে যেসব আবর্জনা নিক্ষেপ করে যাচ্ছেন—সেগুলি হল—উপকূলের বিভিন্ন অঞ্চলে 'ড্রেজ' করা ময়লা, শিল্পাঞ্চলের আবর্জনা, নিষ্কাশী ময়লা, ধাতব পাত্র, বোতল, পুরোনো গাড়ি, জাহাজ ও উড়োজাহাজের ধ্বংসাবশেষ, নির্মাণ কার্যের ফলে এবং ভাঙ্গচুড়ের ফলে জমে যাওয়া ময়লা, বিস্ফোরক ও রাসায়নিক যুদ্ধ সামগ্রী, তেজস্ক্রিয় আবর্জনা, ইত্যাদি।

সমুদ্রকে নিদারুণভাবে দূষিত করে অপরিশোধিত তেল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রিফাইনারীর বাতিল তেল এবং ট্যাঙ্কার থেকে উপচে পড়া তেল। পৃথিবীর পেট্রলিয়াম উৎপাদন বেড়ে চলেছে। তাই সমুদ্রপথে তার আমদানী রপ্তানীর জন্য বড় বড় ট্যাঙ্কার ব্যবহার করা

হচ্ছে। সমুদ্রের নিচে বড় বড় পাইপলাইন ভেঙ্গে যাওয়ার ঘটনাও অনেক শোনা যায়। কোনও কোনও সময় ভূতাত্ত্বিক কারণে উপকূলবর্তী তেলের খনি থেকে তেল বেরোতে পারে। 1970 সালের এক হিসেবে দেখা যায় প্রতি বছর প্রায় 10 লক্ষ মেট্রিক টন তেল স্রেফ পরিবহণের সময় সমুদ্রে পড়ে। তাছাড়া উপকূলবর্তী তেলের খনি বা ঐ ধরনের উৎপাদন থেকে আরও 15 লক্ষ টন।

পোকামাকড় মারার ঔষধ, ডি. ডি. টি. এবং বিভিন্ন ধরনের ইনস্যুলেশনে ব্যবহৃত ক্লোরিন জাতীয় উপাদান সমুদ্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। ডি. ডি. টি. ইত্যাদি সারা পৃথিবীতে ফসল নষ্ট রোধ করার জন্য, মাছি ও পোকা-মাকড় মারার জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সেসব বৃষ্টির জলে ধুয়ে শেষ পর্যন্ত সমুদ্রে গিয়ে জমা হয়। আফ্রিকা থেকে বাতাসে বয়ে আসা ক্ষতিকারক ডি. ডি. টি. 'র অস্তিত্ব বঙ্গোপসাগরে ধরা পড়েছে। ডি. ডি. টি. 'র অধিক মাত্রা মাছ চাষের পক্ষে খুবই হানিকর। এর ওপর রয়েছে মানুষের তৈরি বিভিন্ন ক্ষতিকারক আবর্জনা। 1970 সালের আগস্ট মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নার্ভ গ্যাসের রকেট ভর্তি জাহাজ সমুদ্রে বিসর্জন দেয়। বিভিন্ন উপকূল থেকে বা মহাদেশ থেকে বাতাসে উড়ে আসা যেসব ক্ষতিকারক পদার্থ সবসময় সমুদ্রের জলে বিক্ষিপ্ত হচ্ছে, সেগুলি হল—পারদ, সীসা, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম ইত্যাদি। প্রায় 45 বছর আগেই গ্যাসোলিনে 'টেট্রাইথাইল লেড' যুক্ত হয়েছিল, ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে সীসার পরিমাণ দশগুণ বেড়েছে। পৃথিবীর যে কোনও অঞ্চলের সমুদ্র থেকে 50 গ্যালন জলের নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করলে আণবিক ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ থেকে উদ্ভূত 'তেজস্ক্রিয়তা' ধরা পড়বে।

পারমাণবিক আবর্জনা আসে বিভিন্ন 'পাওয়ার প্ল্যান্ট', মিলিটারী ও শিল্পাঞ্চলের ল্যাবরেটরী, হাসপাতাল, পারমাণবিক বিস্ফোরণ—ইত্যাদি থেকে। তাছাড়া, সমুদ্রের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরীক্ষার জন্য যেসব যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হয়, তা থেকে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে উড়োজাহাজ ও মহাকাশযানের 'পাওয়ার প্ল্যান্ট' গুলো পরীক্ষা নিরীক্ষার পর সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়। তাছাড়া, পারমাণবিক যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় সমুদ্র থেকে প্রাকৃতিক সম্পদ আহরণে, বয়াতে শক্তি দেবার জন্য এবং জল থেকে নুন বের করার জন্য। অনেকেরই হয়ত মনে আছে চীনের সাথে ভারত ও আমেরিকার বিরোধ চলাকালীন একটি পারমাণবিক বাক্সসহ 'গোয়েন্দা যন্ত্র' হিমালয়ে হারিয়ে যায়। যেহেতু সেটা গঙ্গার উৎসের কাছাকাছি রাখা হয়েছিল, সমস্ত গঙ্গার ধারা ও বঙ্গোপসাগরের পক্ষেও সেটা দুশ্চিন্তার কারণ। বাতাসে পারমাণবিক পরীক্ষার ফলে যে তেজস্ক্রিয়তা ছড়ায় তার অনেকটাই সমুদ্রে মিশে যায়।

ভারত মহাসাগরের একটা বাড়তি সমস্যা আছে। সাধারণভাবে এই মহাসাগর বিষুবরেখা থেকে খুব দূরে নয়। ফলে একটু তাপমানের বৃদ্ধির ফলে প্রবাল জাতীয় অনেক প্রাণী ও গাছপালার মৃত্যু ঘটে। ভারতের ক্ষেত্রে সমুদ্রে আবর্জনার সবচেয়ে বড় বাহন সম্ভবতঃ নদীগুলি। বড় বড় শহরগুলি নদীর তীরে অবস্থিত। ধর্মীয় কারণে এবং জনসাধারণের অনগ্রসরতা বা অজ্ঞতার দরুন নদী ও নদীর আশেপাশের অঞ্চল এখানে দূষিত হয় বেশি এবং শেষ পর্যন্ত তার ঠ্যালা সামলাতে হয় সমুদ্রকে। অগ্রসর দেশগুলির অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে শিল্পজাত আবর্জনা সমুদ্র দূষণের বড় উপাদান। ভারত শিল্পগতভাবে ততটা উন্নত না হলেও এর বাড়তি লোকসংখ্যার ফলে আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগর থেকেও বেশি দূষিত হয় ভারতের চারপাশের সমুদ্র।

একথা সত্যি যে স্বাভাবিক ক্ষমতাবলে এইসব দূষিত পদার্থের অনেকটাই সমুদ্র হজম করে নেয় এবং নিরাপদ বস্তুতে পরিণত করে। কিছু আবর্জনা আবার লাভজনক পলল বা ম্যাঙ্গানিজ নডুল জাতীয় খনিজ তৈরিতেও সাহায্য করে। কিন্তু সমুদ্রকে আবর্জনার ডিপো তৈরি করার পক্ষে এগুলি কোনও অজুহাত হতে পারে না।

প্রখ্যাত সমুদ্রবিজ্ঞানী ডঃ জ্যাকুয়েস পিকার্ড-এর মতে বর্তমান দূষণের হার বজায় থাকলে আগামী 25 বছরের মধ্যে পৃথিবীর সমুদ্রে কোনও প্রাণের অস্তিত্ব থাকবে না। মানুষকে এই ধরনের এবং এই আকারের সমস্যার সামনে আগে কখনও পড়তে হয়নি, তাই এর মোকাবিলায় প্রচণ্ড গঠনমূলক মনোভাব প্রয়োজন। সমুদ্র দূষণকে সংযত করা একটি দেশ বা কতিপয় দেশের গোষ্ঠী দ্বারা সম্ভব নয়, একটা বিশ্বব্যাপী সুসংগঠিত কার্যকলাপ গড়ে তোলার কথা অনেকেই ভাবছেন। এবং ভাবনাটা সাম্প্রতিক।

অটোয়াতে 1971 সালের 8 থেকে 12ই জুন অনুষ্ঠিত সমুদ্র দূষণের ওপর আন্তঃরাষ্ট্র কার্যকরী সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে সমুদ্রে কিছু ফেলা এবং পরিবহণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের ওপর আইন প্রণয়নের ব্যাপারে একটা কার্যকরী প্রস্তাব তৈরি হয়। একবছর পর স্টকহলমে অনুষ্ঠিত মানবিক পরিবেশের ওপর জাতিসংঘের সম্মেলনের একটা অবদান হল যে সে বছরের নভেম্বরেই 79 টি দেশের প্রতিনিধিরা একটা আন্তর্জাতিক কনভেনশনে চুক্তিবদ্ধ হন যে, তেল, পারদ, ক্যাডমিয়াম, তেজস্ক্রিয় আবর্জনা ইত্যাদি সমুদ্রে ফেলা চলবে না।

তাঁরা আরও ঠিক করেন যে আর্সেনিক, তামা, ফ্লোরাইড, পোকামারার ঔষধ, সীসা, দস্তা ইত্যাদি রয়েছে এমন রাসায়নিক দ্রব্য কোনও জাহাজ বা উড়োজাহাজ থেকে সমুদ্রে ফেলার ব্যাপারে সরকারী সম্মতি নিতে হবে। 1973 সালের 28শে মার্চ ঘোষণা করা হয় যে বিভিন্ন

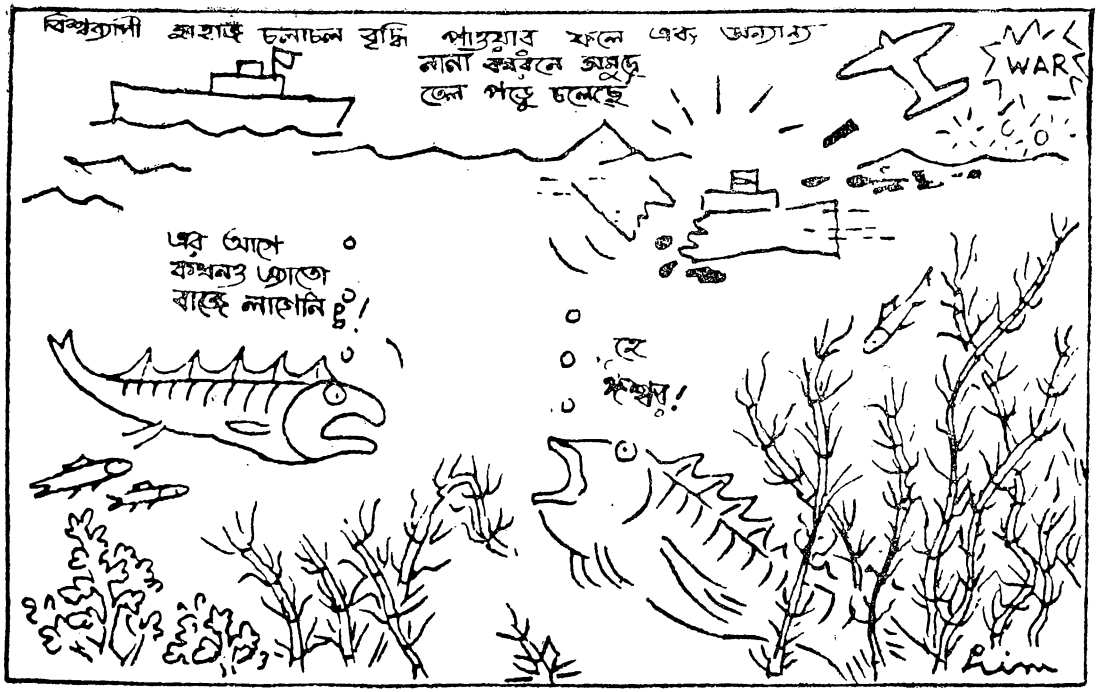

জাহাজ থেকে তেল ও অন্যান্য আপত্তিকর জিনিস এবং নিষ্কাশনী আবর্জনা সমুদ্রে ইচ্ছেমত ফেলার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করার প্রস্তাব সামুদ্রিক নিরাপত্তা সমিতি অনুমোদন করেছে। এরপর গত বারো বছরে অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেক সম্মেলন। গৃহীত হয়েছে অনেক প্রস্তাব।

এ সমস্ত ধরনের প্রস্তাবেরই কার্যকারিতা নির্ভর করবে কতটা বিভিন্ন দেশ এগুলিকে মেনে নেবে। গত দশ বছরে এই প্রশ্নটাই বেশি করে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। অনেকের মতে, যা করা দরকার, তা হল সমুদ্র দূষণ রোধে সক্ষম এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শক্তি যাঁর নিষেধাজ্ঞা সব দেশ শুনবে এবং কার্যকরী করবে। এটা আরও প্রয়োজন, কারণ বিশ্বব্যাপী সমুদ্রের পরিবেশের শতকরা 70 ভাগই কোনও বিশেষ দেশের এক্তিয়ারের বাইরে।

সমুদ্রকে বাঁচাতেই হবে।

ছবি এঁকেছেন ঃ হিমানীশ গোস্বামী।

AE—189, Sector-I, Salt Lake City, Cal-64

ভারতের এ্যাটম ভাবনা

কবিতা সিংহ

টম্ টম্ টম্
এ্যাটম্ এ্যাটম্
ভাঙলো এ্যাটম কী ?
যে লোক যেমন
বানায় তেমন
ধ্বংস বা সৃষ্টি !

এই দ্যাখোনা আমেরিকা
আর রাশিয়া ছিঃ
ভাঙছে এ্যাটম
বানাতে বোম
উড়িয়ে পৃথিবী !
দেখুক চেয়ে কেমন করে
মোদের এদেশ জ্ঞানের জোরে
গড়ার কাজে সৃষ্টি সুখে
পরামাণুর গহীন বুকে
গান জাগিয়ে প্রাণ জাগিয়ে
ঘুচিয়ে সকল ভ্রান্তি
যুদ্ধে বিরোধ ভরা ধরায়
আনছে ফিরে শান্তি।

ধাতব মানুষ

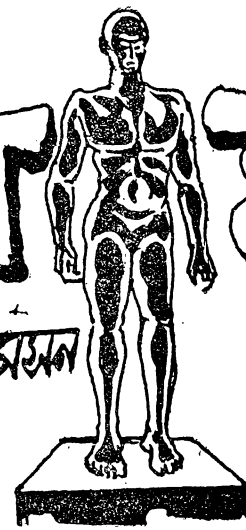

জ্যাক উইলিয়ামসন

অনুবাদ : সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

টাইবার্ন কলেজের মিউজিয়ামে ধুলোয় ভরা এক কোণে চোখে পড়ে এক ধাতব মানুষের মূর্তি! যদিও প্রথম দিকের উত্তেজনা অনেকটাই প্রশমিত হয়ে এসেছে তা সত্ত্বেও ওই মূর্তি বসানো নিয়ে যে আপত্তি উঠেছিল তা আজও বর্তমান। অনেক বিজ্ঞানী চেয়েছিলেন দেহটাকে ব্যবচ্ছেদ করতে আর তার পুরনো বন্ধুদের দাবি ছিল সমাধিস্থ করার।

যে কোন সাধারণ দর্শকের কাছে তিনি একটা পূর্ণাবয়ব, সময়ের ভারে সবুজ হয়ে ওঠা ব্রোঞ্জ মূর্তি মাত্র। খুব ভাল করে লক্ষ্য করলেই দেখা যায় তার চুলের নিখুঁত বাহার, চামড়া আর মুখে জেগে থাকা এক বেদনার ছায়া। কেউ কেউ আবার তার বুকে জেগে থাকা অদ্ভুত ধরনের লাল ছ'কোণ দাগটাও অবাক হয়ে দেখে।

মানুষ আজ প্রায় ভুলতে বসেছে ওই মূর্তি এককালের ভূতাত্ত্বিক দপ্তরের অধ্যাপক টমাস কেলভিনের। এ সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে গুজব আজও আছে আর তা বেশ বেড়েও চলেছে। এইসব গুজব তাঁর বন্ধুদের কাছে খুবই বেদনার বলে তারা শেষ পর্যন্ত আমাকেই তাঁর নিজের লেখা প্রকাশ করতে বলেছেন।

চার বছর ধরে কেলভিন মেক্সিকোয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় ঢালে ইউরেনিয়াম অনুসন্ধান করে চলেছিলেন। গত গ্রীষ্মেই মনে হয় তিনি সে সন্ধানও পান। ফিরে এসে অধ্যাপনা না করে তিনি আরও ছুটির দরখাস্ত করেন।

পরে শুনেছিলাম তিনি তাঁর আবিষ্কারের সর্বস্বত্ব এক সুইশ প্রতিষ্ঠানের কাছে বিক্রি করে দিয়ে ইউরোপের নানা জায়গায় পরমাণু বিকিরণের জৈবিক আর রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। পরে এও শোনা যায় প্যারীর কাছে এক ক্লিনিকে তাঁর চিকিৎসা চলেছে।

এক গুমোট শনিবারের বিকেলে তিনি টাইবার্নে ফিরে এসেছিলেন। আমি বাড়িতেই ছিলাম। সমুদ্রের ধার ঘেঁসে বসে কাজ করছিলাম আমি। জায়গাটা আট-লান্টিক মহাসাগরের কোলে। আচমকাই আমার চোখে পড়ল আমার পাথুরে আশ্রয়ের দিকে একটা নৌকো এগিয়ে আসছে। নৌকোটা একেবারে অচেনা—বেশ লম্বা সেটা। চোরাই মদ যারা চালান করে তাদেরই নৌকোর মত।

বেশ কৌশলে সাহসের সঙ্গেই কারা যেন নৌকোটা ভাসিয়ে আনতে চাইছিলো। নৌকোটা এসে পড়তেই ওটা থেকে লাফিয়ে নামল চারজন লোক। পঞ্চম লোকটি হালের কাছে দাঁড়িয়ে কি যেন হুকুম দিল। বাকি চারজন এবার কিছু দড়ি বাঁধা একটা কফিনের আকারের বাক্স আমার দিকেই টেনে নিয়ে এল।

'টাইবার্ন কলেজ ?' একজন প্রশ্ন করল।

লোকগুলোর দেহ পোড়া মাটির মত, মুখে হলদে দাড়ি। কথায় একটু মার্কিনী টান।

আমি সায় জানালাম।

'তা হলে ঠিকই এসেছি', প্রথম লোকটা হেসে বলল। সে আবার আমার দিকে তাকাল। 'অধ্যাপক রাসেল বলে কাউকে চেনেন ?'

'আমিই রাসেল।'

'তাহলে তো কাজ শেষ। এ বাক্স আপনারই জন্য।'

'ওতে কি আছে ?' [শেষাংশ 57 পৃষ্ঠায়]

খুদে বৈজ্ঞানিক

দিলীপ দাস

যাক গে, মন খারাপ করিসনি, পরে আব. হবে। তা ঐ এক কাপ কেমিক্যাল ওভাবে ফেলে রেখেছিস কেন ?
ধ্যাৎ, ওটা আমার দুধ, খেতে ভুলে গেছি।

আয় আমরা এটা ভাগ করে দুজনে খেয়ে নিই।
ওটা কি পদার্থ আছে। ঠাণ্ডা হয়ে অপদার্থ হয়ে গেছে।

একটু গরম করে নিলেই হবে।
গরম করবি কিসে ? বেসন পাত্রতো দেখছি না এখানে।

কুছ্ পরোয়া নেই। ঐ ফাইলটা থেকে এক পিস পেপার দে, আমি ব্যবস্থা করছি।

দরকার তো বাটি, কাগজ দিয়ে কি হবে ?
বাটি হবে।

কাগজের বাটিতে দুধ গরম করবি ? ম্যাজিক দেখাবি নাকি ?
বাটি তৈরী, দেখ।

ম্যজিকের মতোই একটা মজার ব্যাপার হবে !

ঠাণ্ডা দুধটা এই বাটিতে ঢেলে দিলুম।
এবার বার্নারের আগুনে উত্তপ্ত করি।
ফ্যান্টাস্টিক! কাগজটা পুড়ছে না অথচ দুধ গরম হচ্ছে!
ও রকম কত ম্যাজিক বি সি সরকার দেখিয়েছেন। ট্রিকটা জানলে আমিও পারবো।
এটা কোন ম্যাজিক নয়, এটাতে কোন ট্রিক অর্থাৎ কৌশল নেই। আছে শুধু একটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।
পাতলা কাগজের বাটিতে জল কিংবা দুধ নিয়ে আগুনে ধরলে তাপ দ্রুত পরিবাহিত হয়ে ঐ তরল পদার্থের মধ্যে চলে যায়। ফলে বেশী তাপ জমা হতে পারে না বলে কাগজ দহনাঙ্কে পৌঁছাতে পারে না অর্থাৎ কাগজ পুড়তে পারে না
হুম, বেশ মজার ব্যাপার তো!
অনেক্ষণ ফুটেছে, এখন পেন্সিলটা দিয়ে একটু নেড়ে দিলে হয়।
যাঃ!
এটা কি করলি বেল্লিক?
ফ্যাস-স
!

সব গুবলেট করে দিলি! এটা কি কোন ধাতব বাসন পেয়েছিস যে ঘটর ঘটর করে নাড়বি
স-সরি! ভুল হয়ে গেছে বুঝতে পারি নি যে এমনটা হবে!
বার্নারটা নিভে গেল, টেবিলময় চা, এক বিতিকিচ্ছি অবস্থা করলি।
দাঁড়া, আমি রাম্নুকে ডেকে দিই।
আর দুধ আনতে হবে না, খুব হয়েছে।
না না, ও এসে টেবিলটা মুছে দিয়ে যাক।
সে ভাবনা পরে। এখন মেজকা না এসে পড়লে বাঁচি
মেজকা এসে এ সব দেখলে দুহাতে চুলের মুঠি ছিঁড়বে!
ওরেব্বাস! চুলে হাত দেওয়া আমি ভীষন অপছন্দ করি, আমি চললুম।
নাঃ, এদের কোন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিই নেই। হুড়বড়িয়ে একটা কিছু করে ফেললেই হল যেন!
উলস-, কাগজের পাত্রে গরম করাতে দুধের স্বাদটা মনে হয় একটু বেড়েছে!
চুক- চুক- চুক-

বিজ্ঞান মনস্ক মানুষ চাই

সুভাষ চক্রবর্তী

মন্ত্রী : ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

আপনারা জানেন বিজ্ঞান মনস্ক, যুক্তিবাদী ও সুস্থ জীবনবোধ সম্পন্ন মানুষ গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিরন্তর প্রয়াস চালাচ্ছে। বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও সাফল্য সম্পর্কে নতুন করে কোন কিছু বলার প্রয়োজন হয় না। বিগত কয়েক দশকে বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব অগ্রগতিতে মানব সভ্যতার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

দেশে দেশে বিজ্ঞানের বিপুল সাফল্য ও অগ্রগতি ঘটলেও, আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের দেশের জনগণ সেই সাফল্যের সম্পূর্ণ অংশীদার হতে পারেন নি। অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে আছে আমাদের দেশের বেশির ভাগ মানুষ। বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ গড়ে তোলার কাজে নিদারুণ অবহেলার ফলে বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসেও আমাদের অগণিত সাধারণ মানুষের মধ্যে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, দুর্জ্ঞেয় শক্তির প্রতি আনুগত্য, ক্ষুদ্র সংকীর্ণ মানসিকতা, যুক্তিহীনতা প্রবলভাবে বিরাজ করছে। মানব-জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ যথার্থভাবে না হওয়ার ফলে সমাজের অগ্রগতির পথ কণ্টকাকীর্ণ হয়েছে। সমগ্র সমাজ সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারছে না। পেছন থেকে লক্ষ কোটি মানুষ যেন তাকে টানছে।

বৈজ্ঞানিক চেতনাহীন সমাজ পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে না। তাই জাত-পাত-ভাষা সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের ঐক্যে ফাটল ধরাতে এখানে ওখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতা ও সংকীর্ণতার ভাবনাকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিও ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে।

সন্দেহ নেই, স্বাধীনতা উত্তরকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় আমাদের দেশও বিরাট বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। কিন্তু মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মানুষ ও বিজ্ঞান গবেষকের মধ্যেই বিজ্ঞান চর্চা এখনও আটকে রয়েছে। সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবনে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রয়োগ সাফল্য সেইভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, জীবনবিমুখ ও অবৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যেও অবৈজ্ঞানিক মানসিকতা প্রায়ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বৈজ্ঞানিকের তাবিজ কবজ ব্যবহার, ঝাড় ফুক মানতে বিশ্বাস, পাঁচ আঙ্গুল জুড়ে নানা ধাতুর আংটি ধারণের মত পশ্চাৎপদ জীবনভাবনা আমরা অহরহ লক্ষ্য করছি।

সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে উচ্চশিক্ষার আলোক-প্রাপ্তদের সকলের মধ্যেই যুক্তিবাদী মনের বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস চালানো তাই অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। নিরন্তর অভিযানের মধ্য দিয়েই আমাদের দ্রুত অগ্রসর হতে হবে। 'পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে টানিছে পশ্চাতে' কবিগুরুর এই অমোঘ বাণী স্মরণে রেখেই সমগ্র সমাজকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি। যুক্তিবাদী বিজ্ঞান মনস্ক সুস্থ জীবনভাবনায় চালিত মানুষ গড়ে তোলার জন্য আমরা

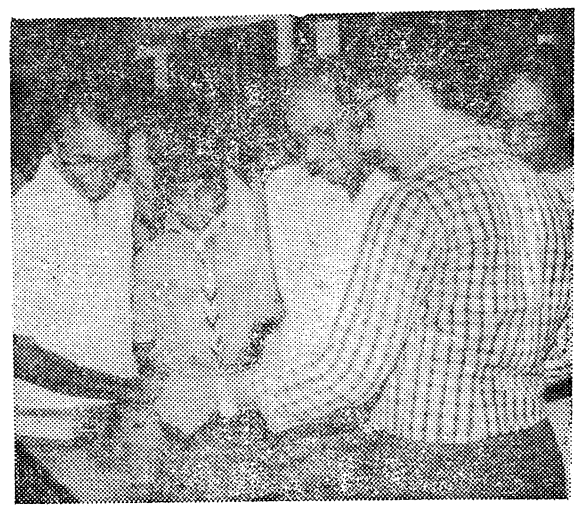

মডেলের কলাকৌশল ব্যাখ্যা করছে এক কিশোর বিজ্ঞানী

লোকপ্রিয়-বিজ্ঞানচর্চার (Popular Science) ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছি।

এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ক্ষুদে বৈজ্ঞানিকদের প্রতিভার স্ফুরণের ওপর আমরা বিশেষ নজর দিয়েছি। প্রতি বছর ব্লকে ব্লকে বিজ্ঞান আলোচনা চক্র, জেলায় জেলায় আলোচনা ও বিজ্ঞান মেলা এবং রাজ্যস্তরে বিজ্ঞান আলোচনা ও মেলার আয়োজন করা হচ্ছে। গত বছর (1985) ডিসেম্বর মাসে সল্টলেকে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে রাজ্যস্তরের বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ মানুষের উজ্জ্বল উপস্থিতি, অংশগ্রহণ ও ক্ষুটে বৈজ্ঞানিকদের উৎসাহিত করার ঘটনায় রাজ্য সরকার উদ্দীপ্ত হয়েছে। এ বছর আরও বৃহৎ আকারে যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে সর্ব ভারতীয় স্তরের বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও মডেল প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হচ্ছে। আগামী 6 নভেম্বর থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী ও আলোচনা চক্র। সারা দেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞান গবেষণা সংস্থা, বিজ্ঞান ক্লাব ও চর্চা কেন্দ্র এতে অংশগ্রহণ করবে। এ ছাড়াও শিক্ষার্থী প্রতিভাধর ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের মডেল তো থাকবেই। বিজ্ঞান প্রদর্শনী, মডেল এবং আলোচনাচক্রের মূল বিষয় স্থির করা হয়েছে চারটি : জাতীয় সংহতি, গ্রামোন্নয়ন, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য এবং শান্তি। বিজ্ঞান প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন মাননীয় রাজ্যপাল অধ্যাপক নুরুল হাসান এবং সভাপতির আসন অলংকৃত করবেন কলকাতার মেয়র শ্রদ্ধেয় কমল কুমার বসু।

বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও মডেল প্রতিযোগিতা এবং আলোচনা চক্রের প্রতিদিনে অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া এবং উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্য সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগের পক্ষ থেকে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আপনাদের সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উপস্থিতি বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী মানুষ গড়ার কাজ তরান্বিত করবে এই বিশ্বাস আমাদের আছে।

অভিনন্দন সহ—

কৃতী ছাত্র-ছাত্রী সংবর্ধনা

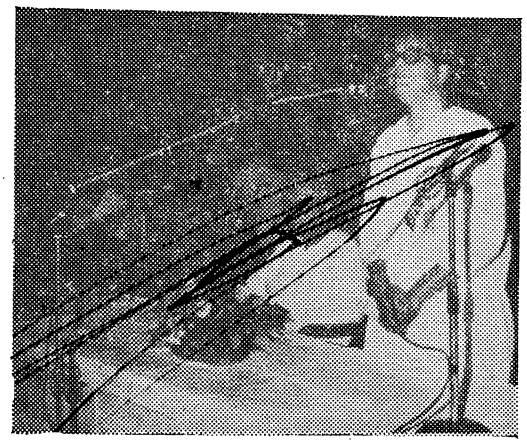

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন পর্ষদ সভাপতি রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায় বাঁদিক থেকে : পর্ষদ সচিব সুদিন চট্টোপাধ্যায় ও অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। **ফটো : শুভঙ্কর মুখার্জী**

স্বাধীনতার 40 বছর পরেও দেশে 60 শতাংশ নিরক্ষর রয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতার আগে এ কথা ভাবা যায়নি। মনে হয়েছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অবসান হলে দেশে মূর্খ আর থাকবে না। যাঁরা পরিকল্পনা করেন তাঁদের হাবভাব দেখে মনে হয় অল্প মানুষের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু, 7 অক্টোবর 1986 মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় শতবার্ষিকী হলে কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশে এইকথাগুলি বলেন।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীকান্তি বিশ্বাস বলেন, শিক্ষা নীতিতে বিজ্ঞান পড়াশোনার গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়ার কথা হচ্ছে। জীবন বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান মিলে 100 নম্বর করা হবে। এছাড়া ইতিহাস ও ভূগোলে 50 নম্বর করে প্রশ্ন হবে আর এই নম্বরের স্থান পূর্ণ করবে হিন্দি ভাষা। তিনি বলেন শিক্ষা ক্ষেত্রে কোন পরিকল্পনা নিতে হলে ভাল ভাবে চিন্তা করে নিতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ কৃতী ছাত্র ছাত্রীদের পুরস্কার দেন—একথা বলেন পর্ষদের সচিব সুদিন চ.ট্টোপাধ্যায়।

পুরুলিয়া জেলার প্রথম স্থানাধিকারিণী কমলিকা আকস্মিক দুর্ঘটনায় অকাল মৃত্যুর জন্য অনুষ্ঠানে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

অনুষ্ঠানের শেষে পর্ষদের সভাপতি রঞ্জু গোপাল মুখার্জী উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

—কানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞানের সাফল্য—সকলের জন্য

সৌরেন ভট্টাচার্য

আজ আমরা এসে দাঁড়িয়েছি একবিংশ শতাব্দীর দোড় গোড়ায়। ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের অনেক চিন্তানায়ক এবং রাষ্ট্র নায়কদের আশা বা ধারণা যে ভারতবর্ষ একবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক সভ্যতার নিরিখে চরম উৎকর্ষ লাভ করবে। আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতি বলতে কি বোঝায় বা তার স্বরূপ কি হওয়া উচিৎ এই কূটতর্কে না গিয়েও বলা যায় যে ঐ সব চিন্তানায়কেরা অগ্রগমন বলতে শিল্প সাহিত্যে সংস্কৃতির সুস্থ বিকাশের থেকেও বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন বৈজ্ঞানিক কারিগরীর ক্ষেত্রে কুশলতা অর্জনের উপর। ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র এবং উন্নতিকামী দেশের ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির যতটুকু অগ্রগতি দেশের ও দশের কল্যাণে নিয়োজিত হবে এবং সমাজজীবনে আমাদের স্বনির্ভর করে তুলবে তাকে আমাদের স্বাগত জানাতেই হবে এবং তার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চলিতে হবে। কেবলমাত্র মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণ, অন্তরীক্ষ যুদ্ধের উপকরণ তৈরী এবং ভোগ-বিলাসের উপকরণ তৈরীকেই বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মানদণ্ড বলে মেনে নেওয়া যায় না। মুষ্টিমেয় কিছু প্রতিভাবর ব্যক্তির প্রযত্নে এবং প্রচুর অর্থের বিনিময়ে পাওয়া কিছু আবিষ্কারের ফল বৃহত্তর জনসমাজের কাছে অনাস্বাদিত এবং অপ্রয়োজনীয় থেকে যায়। সে প্রচেষ্টা যা হচ্ছে তা হতে থাক, কিন্তু ভারতবর্ষের আপামর জনসাধারণের কাছে বিজ্ঞানের অগ্রগতির অর্থ আরও ব্যাপক।

সভ্যতার যে সিঁড়ি ধরে মানব সভ্যতা ধাপে ধাপে এগিয়ে গেছে তার প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সে অগ্রগমনের সঙ্গে বিভিন্ন যুগের বিজ্ঞান ভাবনা, বিজ্ঞানচর্চা এবং বিজ্ঞান-মানসিকতার নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই ভারত মহাদেশের চিকিৎসা বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, রসায়ন প্রভৃতি কত উন্নত ছিল তা জানলে অবাক হতে হয়। কিন্তু যত দিন গেছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের অগ্রগমন ততই পিছিয়ে পড়েছে। আরও ভয়ের কথা হ'ল অজ্ঞানতা, অশিক্ষা ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার প্রভৃতি ভারতীয় জনসমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরেছে। এইসব অভিশাপের প্রভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করে একবিংশ শতাব্দীতে মাথা উঁচু করে প্রবেশ করতে হলে জনগনকে বিজ্ঞান সচেতন বা বিজ্ঞান মনস্ক করে তুলতে হবে।

দীর্ঘদিনের সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা এবং উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থার আওতায় থাকার ফলে ভারতবর্ষে যে শিক্ষাব্যবস্থা চালু হয়েছিল তা কখনোই ছাত্রের মানসিকতাকে বিজ্ঞানমুখী করে তোলেনি তবুও পরাধীন ভারতবর্ষে অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বাংলার অবস্থান ছিল একটু ভিন্নতর। পূর্ব ও পশ্চিমের যা কিছু ভাল তার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম প্রভৃতি নানা দিকে নতুন নতুন সৃষ্টি, নূতন নূতন ভাবধারার বিকাশ তখন বাংলায় নবজাগরণের জোয়ার নিয়ে এসেছিল, এ ব্যাপারে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের নাম উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত বিষয়গুলির চরম উৎকর্ষ ছাড়াও বাঙালি জাতির সামনে জীবনযাত্রার ধরণে তাঁরা এমন এক নতুনধরণের সুস্থ সহজ, সুরুচিপূর্ণ ধারার প্রবর্তন করেছিলেন যা এখনও আদর্শ বলে স্বীকৃত হয়। অথচ বৈজ্ঞানিক চেতনার অনুপ্রবেশ সেখানেও তেমন ভাবে প্রথমে ঘটেনি।

অথচ পশ্চিমে তখন বিজ্ঞান চর্চা প্রবল ভাবে এগিয়ে চলেছে। সেখানকার নবজাগরণের ঢেউ পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। কি বিশাল তার সম্ভাবনা। কিন্তু ইংরেজ প্রভুরা কখনোই চায়নি যে ভারতীয়রা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হোক তাদের মধ্যে বিজ্ঞান-মনস্কতার বিকাশ ঘটুক। কিন্তু মহান বাঙালি রামমোহন রায়, বঙ্কিমচন্দ্র, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাঙালি সম্প্রদায়কে তাঁদের লেখনী ও কর্মধারার মাধ্যমে বিজ্ঞান সচেতন করার গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে ছিলেন। পরবর্তী কালে প্রফুল্লচন্দ্র, জগদীশচন্দ্র, মেঘনাদ সাহার মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরা সে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেও বিজ্ঞান মানসিকতা এবং বিজ্ঞানচর্চা সেভাবে প্রসার লাভ করেনি। ফলতঃ অনুসন্ধিৎসা, পর্যবেক্ষণ এবং আবিষ্কারের আগ্রহ তেমনভাবে গড়ে উঠেনি।

সুখের কথা সাম্প্রতিক কালে রাষ্ট্রের কর্ণধাররা একথা অনুধাবণ করেছেন যে বিজ্ঞানের উন্নতি না হলে জাতীর উন্নতি সম্ভবপর নয়। এবং ব্যাপকভাবে সর্বস্তরে বিজ্ঞান চর্চা এবং বিজ্ঞান মানসিকতার বিকাশ ব্যতিরেকে বিজ্ঞানের উন্নতিও অসম্ভব।

বিজ্ঞানের জগৎ আজ অনেক বড়। ভূ-পৃষ্ঠের গভীর থেকে অসীম মহাকাশে তার আনাগোনা। বিশ্বচরাচর সৌরজগৎ, অণু পরমাণুর ইতিবৃত্ত, আরও কতকি।

কিন্তু বৈজ্ঞানিক মানসিকতা বা বিজ্ঞান মনস্কতা বলতে আরও কিছু বোঝায়। এর অবস্থান সকল জ্ঞানের গভীরে। সত্যকে জানার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা, অনদমনীয় অনুসন্ধিৎসা। সব কুসংস্কার এবং মোহকে কাটিয়ে মানবকল্যাণে নিযুক্ত হওয়ার আগ্রহকে লালন করে এই বৈজ্ঞানিক মানসিকতা।

ভারতবর্ষে দুএকটি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমবাংলায় সরকারী ভাবে ছাত্র ছাত্রীদের এই বিজ্ঞান মনস্কতা গড়ে তোলার ব্যাপক প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। বিড়লা শিল্প ও কারিগরী সংগ্রহশালার সঙ্গে যৌথ উদ্দ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের যুবকল্যান বিভাগ প্রতিটি ব্লকে প্রতিযোগিতা মূলক বিজ্ঞান আলোচনাচক্রের আয়োজন করে থাকেন। গ্রাম বাংলায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে এই প্রতিযোগিতা এক বিশাল উন্মাদনার সৃষ্টি করে। আলোচনাচক্রকে সামনে রেখে গ্রামবাংলার প্রত্যন্ত প্রদেশের বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যেও বিজ্ঞান চর্চার বিকাশ ঘটে।

এই প্রতিযোগিতার সফল প্রতিযোগীরা ক্রমে ক্রমে ব্লক থেকে জেলা, জেলা থেকে রাজ্য এবং রাজ্য থেকে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে থাকে। এছাড়া জেলা ও রাজ্যস্তরে অনুষ্ঠিত 'মডেল প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা' বা বিজ্ঞানমেলা সংশ্লিষ্ট প্রতিটি ছাত্রছাত্রী ছাড়াও সমাজের একটা বড় অংশের মধ্যে উৎসাহের সঞ্চার করে। বর্ত্তমান বামফ্রন্ট সরকারের উদ্দ্যোগে এই কর্মসূচীগুলি বেশ সাফল্যের সঙ্গে পালিত হচ্ছে।

সরকারী প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগেও এই বিজ্ঞান চর্চাকে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাভাষায় পত্র পত্রিকা, পুস্তক প্রকাশ ও অন্যান্য কর্মসূচী গ্রহণের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রী এবং জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি করতে হবে। মনে রাখতে হবে, বিজ্ঞান চর্চা একটি বিশেষ শ্রেণীর কুক্ষিগত না থেকে যতই বেশী বেশী করে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে, ততই বিজ্ঞানের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে। নানা রকম সামাজিক অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে ততই দেশ এগিয়ে চলবে এক সুস্থ আলোকময় ভবিষ্যতের দিকে।

6 জর্জ গেট রোড, কলকাতা-20

আধুনিক ফ্যাশান বলতেই

তন্তুজ

বাংলার তাঁতের কাপড়

আর্ষণীয় রূপ মসৃণ বুনন উজ্জ্বল রঙ
সঠিক পরিমাপ সবার উপর নতুন নতুন

—চটকদার—
ডিজাইন ও ন্যায্য দাম

শাড়ী, ছাপা শাড়ী (সুতী এবং সিল্ক), ধুতী, বিছানার চাদর, বিছানার ঢাকা ও গৃহসজ্জার দ্রব্যাদি

—এ ছাড়াও বিশেষ আকর্ষণ—

পোলিয়েষ্টার সুটিং এবং সার্টিং ইত্যাদি

জনতা শাড়ী, ধুতি ও লুঙ্গী
তন্তুজ বিপণীতে পাওয়া যায়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স
কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড,
৪৫, বিপ্লবী অনুকুল চন্দ্র স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭০০০৭২

কবি ও বিজ্ঞানী

প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ

দিবাকর সেন

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 70তম জন্মজয়ন্তী উৎসব পালিত হয় 1932 সালের 11ই ডিসেম্বর তারিখে। কলকাতার টাউন হলে। এই জয়ন্তী সভার সভাপতি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সভাপতির ভাষণে তিনি বললেন ; 'আমরা দু'জনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় এক ঘাটে এসে পেঁাচেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

'আমি, প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই, যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তাঁর ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন,....বস্তু জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদ্ঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন, কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তাঁর গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি।

'সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন, এমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

'উপনিষদে কথিত আছে, যিনি এক তিনি বললেন—আমি বহু হব। সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছার নিয়মে। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে তিনি বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহু চিত্তের মধ্যে। নিজেকে অকৃপণভাবে সম্পূর্ণ দান না করলে এ কখনও সম্ভব হোত না।...'

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ দুই ছত্রের এক কবিতার পাণ্ডুলিপি প্রফুল্লচন্দ্রকে উপহার দেন! তাতে লেখা—

প্রেম রসায়নে ওগো সর্বজন প্রিয়,
করিলে বিশ্বের জনে আপন আত্মীয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণের উত্তরে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে দেখিয়ে উপস্থিত শ্রোতাদের চমকে দিয়ে বললেন, 'উনি আমার মাস তিনেকের বড়। বরাবর আমাকে স্নেহ করতেন এই-ই জানতাম। এখন কেন যে আমার সঙ্গে এমন শত্রুতা করছেন জানি না।...এই রাজশেখরকে দিয়ে আমি কোন রকমে বেঙ্গল কেমিক্যাল চালাচ্ছি। কিন্তু উনি এমন ভাবে ওর মাথায় সাহিত্য ঢুকিয়ে দিয়েছেন, প্রশংসা করে ওকে এমন বাড়িয়ে দিয়েছেন—আর কি বেঙ্গল কেমিক্যালে ও থাকতে চাইবে।' ...তারপর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বললেন, 'ওঁর আগের লেখাগুলো বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। আজকালকার লেখাগুলো কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া। বুঝতে পারি না ঠিক।' প্রফুল্লচন্দ্রের এই বক্তৃতার পর হাসিমুখে রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'আজকের লেখাটা বুঝতে পেরেছেন ত!' চারদিকে হাসির রোল পড়ে গেল। শ্রোতারা আশ্বস্ত হলেন।

এই ছিল দু'জনের সম্পর্ক। এ অন্তরঙ্গতার উৎস খুঁজতে আমাদের ফিরে যেতে হবে তাঁদের যৌবনে। বিদেশে উচ্চশিক্ষার পর 1888 সালে প্রফুল্লচন্দ্র দেশে ফেরেন। দেশে ফেরার পর প্রায়ই তিনি আচার্য জগদীশচন্দ্র ও পত্নী অবলা দেবীর অতিথি হতেন। এর পর জগদীশচন্দ্র নিজের বাড়ি তৈরি করেন 93 আপার সার্কুলার রোডে। প্রফুল্লচন্দ্রও বসবাস শুরু করেন 91 আপার সার্কুলার রোডে। প্রায় রোজই তিনি হাজির হতেন আচার্য জগদীশচন্দ্রের বাড়িতে। সম্ভবত সেই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা প্রগাঢ় হয়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান হন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ছিলেন খাঁটি বাঙালী। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যুবশক্তির শ্রমবিমুখতাই তাদের পরাজয়ের মূল কারণ। তাই যুবকদের জীবন সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তাঁর ব্রত। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন যাপনের পদ্ধতিও ছিল খুবই সাধারণ। প্রাচুর্যময় জীবন তিনি সযত্নে পরিহার করে চলতেন। তাঁর সমস্ত জীবনে ছাত্ররাই জড়িয়ে ছিলেন চিরকাল। তিনি ছিলেন ছাত্র ও যুব সমাজের কাছে জীবন্ত প্রেরণা। তাই বন্ধুদের সঙ্গে মানসিক যোগাযোগ ফল্গুধারার মত অটুট থাকলেও তাঁর সরাসরি যোগাযোগ ছিল ছাত্রদের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ ও প্রফুল্লচন্দ্র—দু'জনেরই ছিল কর্মবহুল জীবন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ কিছুটা কম হ'ত। কিন্তু তাঁদের মানসিক যোগাযোগ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিল অম্লান। তাই বোধহয় রবীন্দ্রনাথ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের 80 তম জন্মদিনে লিখেছিলেন, 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতি আমার ও দেশের অর্ঘ্য দেয় তা বিপুল। কিন্তু আমার অসুস্থ শরীরের শক্তি সামান্য। অতএব অধিকাংশ রইল মৌনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন।'

আর রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে

প্রফুল্লচন্দ্র

একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোনো বিশেষ কার্যে (বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজার) অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন 'কেষ্টবিষ্টু'। সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।··· আমাদের পরশুরামও প্রায় 43—44 বৎসর বয়সে লিখিতে আরম্ভ করিয়া ছলেন। আসল কথা এই যে আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে, আর একটি তীব্র সমালোচনা করুন যে পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে ?···

ভবদীয়—

প্রফুল্লচন্দ্র রায়

রবীন্দ্রনাথ

প্রফুল্লচন্দ্র বলেছিলেন, 'রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণে ভারতের, বিশেষ করিয়া বাংলার ও বাংলা সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার পরিমাণ করা আমাদের সাধ্যের বাহিরে।....বাংলা ভাষা আজ যে পৃথিবীর সর্বত্র আদৃত তাহার মূলে রহিয়াছে রবীন্দ্রনাথের প্রাণপণ চেষ্টা।...রবীন্দ্র-প্রতিভার উন্মেষকালেও যে তথাকথিত শিক্ষিত ব্যক্তিরাও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তেমন আস্থাবান ছিলেন না, তাহা অনায়াসেই বলা যায়। বঙ্কিমের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার ফলে অবশ্য ঐ অবস্থা ক্রমশ গড়িয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাহার গতিবেগ খুব বেশি ছিল না।···তাঁহার আলোক সামান্য সৃজনশক্তি ও অতুলনীয় কাব্য-প্রতিভার মাধুর্য উপভোগ করিতে পারিয়াছে, এবং কোনো প্রকার অতিশয়োক্তি না করিয়াই বোধ হয় বলা যায়, সর্বদেশ সর্বকালে 'শ্রদ্ধানতশিরে তাঁহার সার্থক সৃষ্টির পূজা করিবে।···'

* * * *

নিচে প্রৌঢ় রাজশেখর বসুকে কেন্দ্র করে প্রফুল্লচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপের উপভোগ্য অংশবিশেষ তুলে দেওয়া হ'লো। তাতে দেখা যাবে কেন প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর 70তম জন্মজয়ন্তী ভাষণে রবীন্দ্রনাথকে অনুযোগ করেছিলেন।

প্রফুলচন্দ্রের চিঠি—

....সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। 'গড্ডলিকা'র প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য-সম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে (রাজশেখর বসু) আমি বলিলাম এ প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাঁহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারী

রবীন্দ্রনাথের উত্তর—

···আমারই পরে অভিযোগ যে আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায় না ; একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে তার বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন কত ছেলে যারা আজ পেটমোটা মাসিক পত্রে ছোট গল্প আর মিলহারা ছন্দের কবিতায় সাহিত্য-লোকে একেবারে কিম্কিন্ধ্যা কাণ্ড বাঁধিয়ে দিতে পারত,... তাদের আপনি কাউকে বি. এস-সি কাউকে ডি. এস. সি লোকে পার করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী ক'রে তুলতেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি।···

আমার কথা যদি বলেন—আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি, বরঞ্চ মনের মধ্যে একটু গুমর হয়েছে।··· যে সব জন্ম-সাহিত্যিক গোলেমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের ফের একবার জাতে তুলব। আবার এক একবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন। কিন্তু আপনার আর উদ্ধার নেই। যাইহোক, আমি রস যাচাইয়ের নিয়মে আঁচড় দিয়ে দেখলেম আপনার বেঙ্গল কেমিক্যালের এই মানুষটি একেবারেই কেমিক্যাল গোল্ড নন, ইনি খাঁটি খনিজ সোনা।

এ অঞ্চলে যদি আসতে সাহস করেন তা হলে মোকাবিলায় আপনার সাথে ঝগড়া-ঝাঁটি করা যাবে।

ইতি—১৮ অগ্রহায়ণ ১৩৩২

আপনার
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগ্রহ সূত্র : আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মজার ইলেকট্রনিক্স প্রোজেক্ট

পার্থসারথি চক্রবর্তী

আজকাল সকলের বাড়িতে ছাদে জলের ট্যাঙ্ক থাকে। বড় বড় শহরের মালটিস্টোরিড বিল্ডিং-এ যে জলের ট্যাঙ্ক থাকে সেটা দেখতে বেশ বড়। ট্যাঙ্কে জলের লেবেল কোথায় আছে সেটা একটা সুন্দর ইলেকট্রনিক্স যন্ত্র দিয়ে মাপা যায়। কেবলমাত্র একটা IC এবং আনুষঙ্গিক কিছু উপকরণের সাহায্যে সহজেই তোমরা এই সলিড-স্টেট ওয়াটার লেভেল ইনডিকেটর বানিয়ে নিতে পার। কতকগুলি লাইট এমিটিং ডায়োডের (LED) সাহায্যে এটা তৈরি করতে হবে। এই সার্কিট-কে একটা ছোট প্লাস্টিকের বাক্সের মধ্যেও বন্দী করা যেতে পারে।

সাধারণত বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের PVC ইনসুলেটেড কেবল (Cable) তার ব্যবহার করা হয় ট্যাঙ্কে জলের লেভেল কতটা আছে তা জানার জন্য। ট্যাঙ্কের উচ্চতাকে ছয়টা সমান অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। এইবার ছয়টা PVC Cable-এর উচ্চতা বরাবর কেটে নিতে হয় যাতে তারা ছবিতে যেমন দেখানো হয়েছে সেই রকম জায়গায় শেষ হয়ে যেতে পারে।

ইলেকট্রিক কারেন্ট-এর গতিপথ সম্পূর্ণ করবার জন্য PVC-এর তৈরি একটা অতিরিক্ত Cable (যার নাম Reference Probe) বসানো হয় (ছবি দেখ-REF); এখানে খেয়াল রাখবে যেন এই রেফারেন্স কেব্‌লটি অন্যগুলোর চাইতে বেশ গভীরে থাকে। যদি অবশ্য জলের ট্যাঙ্ক ধাতুর তৈরি হয়, তাহলে তোমার এই Reference দরকার নেই। তুমি কৌশলে Reference টার্মিনাল হিসাবে ধাতুর তৈরি জলের ট্যাঙ্ককেই টার্মিনাল হিসাবে ব্যবহার করতে পার।

এই সার্কিটটাও খুব সহজ, ঘোর প্যাঁচের বালাই নেই এতে। খরচও সামান্য, এবং এখানে একটা মাত্র CMOS ইনটিগ্রেটেড সার্কিট টাইপ 4050 ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই IC-তে রয়েছে ছয়টা non-inverting buffer Stages ; এবং সবগুলো buffer Stage-ই স্বাধীনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই buffer এমনভাবে কাজ করে যাতে IC-এর আউটপুট ড্রাইভ বেড়ে যায়। এ ছাড়া buffer-এর নন-ইনভার্টিং অপারেশনের অর্থ এই যে তারা খুব বেশি আউটপুট দিতে পারে, বেশি ইনপুটের জন্যে। যদিও নন-ইনভার্টিং বাফার-এর আউটপুট অনুসরণ করে তার ইনপুটকে, তবুও ইনপুটের কারেন্ট মাইক্রো এ্যাম্পিয়ারের ভগ্নাংশ ছাড়া আর কিছু নয়। আবার মজা এই যে, এর Corresponding আউটপুট যথেষ্ট কারেন্ট দিতে পারে বেশ কিছু মিলি এ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত যা নাকি LED-কে পরিচালনা করবার পক্ষে যথেষ্ট।

জলের এই মাধ্যম বিদ্যুৎ পরিবহণ করবার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল নয়। তবে এর মধ্যে সামান্য নুন দিলে ওটা বিদ্যুৎ পরিবহণ করতে পারবে। যখন জলের লেভেল Reference Probe ও অন্যান্য Probe-এর সঙ্গে সংযোগ ঘটাবে তখন এই জলের ঈষৎ বিদ্যুৎ পরিবাহিতা ভোল্টেজ ইনপুট বেশ কমিয়ে দেয়। Buffer-এর এই

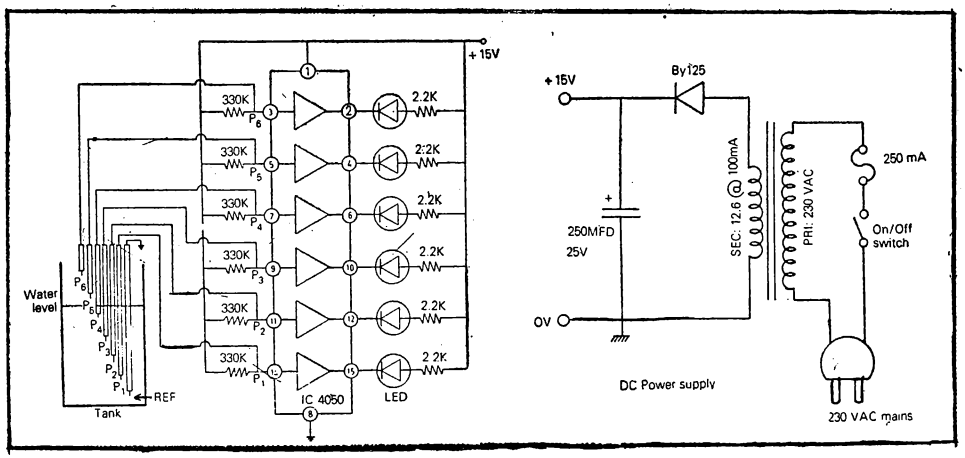

ইনপুট ভোল্টেজ কমে যাওয়ার জন্য Corresponding আউটপুট প্রায় শূন্যে অর্থাৎ ground level-এ নেমে আসবে। যেহেতু LED গুলি লাইনের পজিটিভ সাপ্লাই-এর সঙ্গে যুক্ত (2·2k রেজিস্টরের মাধ্যমে)—তাই তাদের মধ্যে দিয়ে সম্পূর্ণ কারেণ্টই চলাচল করবে এবং জ্বলতে থাকবে। কাজেই উজ্জ্বল LED-এর সংখ্যাগুলি থেকে ট্যাংকের water level সহজেই জানা যেতে পারে।

ছবিতে ছয়টা LED, IC-এর ছয়টা buffer দিয়ে কিভাবে চলতে পারে তা দেখানো হয়েছে। তুমি ইচ্ছা করলে সার্কিট repeat করে LED-এর সংখ্যা বাড়াতে পার। অবশ্য এক্ষেত্রে বাড়তি level Sensing probe-ও বসাতে হবে।

কি কি জিনিস চাই

সেমিকনডাকটর ঃ IC 4050—একটা ; LED 6টা, রেক্টিফায়ার ডায়োড BY 125—একটা **ক্যাপাসিটর ঃ** ইলেকট্রোনাইটিক 250 MF, 25V একটা **রেজিসটর** (সমস্ত হাফ ওয়াট টাইপ) 330k—6 টা 2·2k—6 টা এ ছাড়া চাই IC এক্সপেরিমেণ্ট ভেরোবোর্ড, ফিউজ 250 MA হোল্ডার সহ, অন অফ সুইচ PVC ইনসুলেটেড তার, কেরল, স্ক্রু, তার, সলডার LED হোল্ডার এই সব।

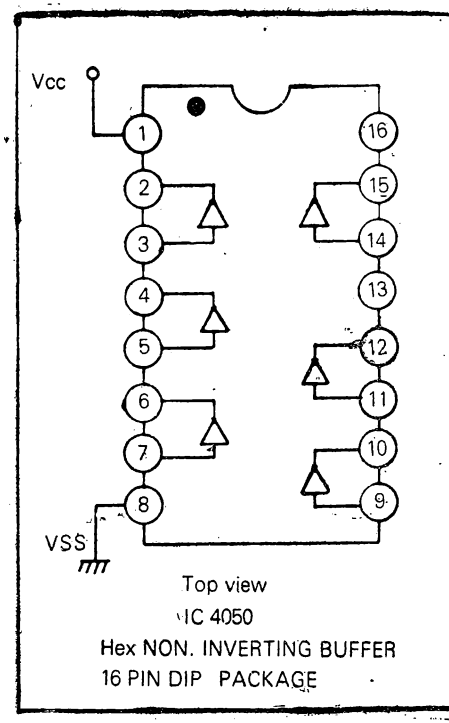

রবীন্দ্র জন্মবার্ষিকী জাদুবর্গ গোপাল চক্রবর্তী

বাংলা 25·01·1268 (ইংরাজী 07·05·1861) থেকে বাংলা 25·01·1393 (ইংরাজী 09·05·1986) একশ পঁচিশ বর্ষ। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ভারত তথা বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের রবীন্দ্রানুরাগীরা কবিগুরুর 125তম জন্মবার্ষিকী পালন করছেন বিপুল উদ্দীপনার মধ্যে।

কবির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি নিচের চারটি জাদুবর্গের মাধ্যমে। প্রথম জাদুবর্গদ্বয়ের মূল সংখ্যা চারটি হল 25, 01, 13 ও 93 এবং দ্বিতীয়টির মূল চারটি সংখ্যা 09, 05, 19 ও 86, প্রত্যেক জাদুবর্গের মূল চারটি সংখ্যার সঙ্গে অন্যান্য বিভিন্ন সংখ্যা বসানো হয়েছে। জাদুবর্গদ্বয়ের সংখ্যাগুলিকে উলম্বভাবে, সমন্তরালভাবে, কোনাকুনিভাবে যে দিকেই যোগ করা যাক না কেন যোগফল 125 হবে। জাদুবর্গদ্বয়ের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে জাদুবর্গের চারটি কোণের চারটি সংখ্যার যোগফলও 125।

যদি 125 বর্ষকে ইংরাজী জন্ম তারিখের মতে অর্থাৎ ইংরাজী 07·05·1861 (বাংলা 25·01·1268) থেকে ইংরাজী 07·05·1986 (বাংলা 23·01·1393) ধরা হয় তবে উপরের জাদুবর্গদ্বয়ের সমধর্ম বিশিষ্ট নিচের জাদুবর্গদ্বয় করা যায়।

25·01·1393

25	02	05	93
88	01	13	23
08	15	96	06
04	107	11	03

রবীন্দ্র জাদুবর্গ

09·05·1986

09	29	01	86
93	05	19	08
21	18	83	03
02	73	22	28

07·05·1986

07	31	01	86
95	05	19	05
21	18	83	03
02	71	22	30

রবীন্দ্র জাদুবর্গ

23·01·1393

23	02	07	93
90	01	13	21
08	15	96	06
04	107	09	05

রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন 'ভারতকোষ' বই-এ প্রভাত মুখোপাধ্যায় 7ই মে, 1861-কেই সমর্থন করেছেন। —লেখক।

প্রোফেসর বি. ডি. অনেক খেটে খুটে কিছুদিন জাপানে থেকে ডঃ হাসিমারার কাছে কাজ করে রোবট তৈরি শিখে এসেছিলেন। কিন্তু ওরা যে জিনিস করে প্রোঃ সেদিকে গেলেন না। তিনি করলেন একটি কিশোর রোবট, নাম দিলেন রোবু।

সে ছড়া বলে, গল্প বলে ঠিক একটি ছেলের মত। দেখতেও সুন্দর, কপালের ওপর চুল এসে পড়েছে। যন্ত্রের পুতুল বলে মনেই হয় না। প্রোঃ বলেন, বাড়িতে ছেলে-মেয়ে দেখাশোনা করার সমস্যাটা দেখতে হবে না? এ কি? যোগ্য লোক কোথায়? আমি রোবুকে সেই কাজের উপযোগী করে তুলেছি।

খবরটা ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগল না।

মিঃ হিঙ্গোরানী তিনটি বিশাল ব্যবসার মালিক, থাকেন আলিপুরের অভিজাত পাড়ায়। একটি মাত্র মেয়ে লাভলি। যত ভাবনা তাকে নিয়ে।

হিঙ্গোরানী রোবুকে সংগ্রহ করলেন অনেক টাকা দিয়ে।

রোবুকে পেয়ে লাভলি প্রথমটা পুতুল মনে করে ওকে বিশেষ আমল দেয়নি। কিন্তু একদিন সবুজ লনে হলিহক ফুলের ঝাড়ের পাশে বেঞ্চে এসে রোবুর কথা ছড়া গল্প শুনে সে একেবারে মুগ্ধ। বাড়িতে এসে মামমীর কাছে কী প্রশংসা রোবুর।

মিঃ হিন্দোরানী খুব খুশি। তাঁর বক্তব্য—লোকের দ্বারা যা হয় না যন্ত্রের দ্বারা তা হয়।

লাভলির বয়স ৮/৯ বছর। তা হলে কি হবে, সে যে ভাবে লাভলির সঙ্গে মেশে তা কোনো কোনো সময় কিন্তু লাভলির মায়ের কাছে ভাল লাগে না। একদিন সে নাকি লাভলিকে বলেছিল 'ডার্লিং' আর যেন কি ছড়া বলেছিল—বাস্! মিসেস হিঙ্গোরানী স্থির করলেন ওকে বিদায় করতেই হবে। স্বামীকে চেপে ধরতে তিনি বাধ্য হয়ে রোবুকে নিয়ে সোজা প্রোফেসারের বাড়িতে দিয়ে এলেন।

প্রোঃ স্তম্ভিত। ধনীলোকের বাড়ির মহিলারা এমন কাজ করে বসেন যার ব্যাখ্যা হয় না। কি আর হবে। সহকারী ব্রোঞ্চিকে বললেন, একে সাবধানে ল্যাবে রেখে এসো। ব্রোঞ্চি আদেশ পালন করল কিন্তু রোবুকে ঘুম-পাড়ানি সুইচটা টিপতে ভুলে গেল।

গভীর রাত। সকলে ঘুমুচ্ছে। রোবুর চোখে ঘুম নেই। তার কলকব্জা সবই সচল। সে বেরিয়ে পড়ল ল্যাবের পেছনের দরজা দিয়ে। কেউ দেখল না তাকে।

সকালে চা খেতে খেতে রোবুর অন্তর্ধানের খবরে প্রোঃ মর্মাহত হলেন। বললেন, এটা নিশ্চয়ই চুরি, কিডন্যাপিং। প্রেসে খবরটা দাও, পুলিশকেও।

এদিকে রোবু শেঁকুল কাঁটার ঝোপঝাড় পেরিয়ে বড় রাস্তায় যখন উঠে পড়ল তখন ভোর হচ্ছে। এই সময়টাই

আবার বেণী শঙ্কর'র প্রাতঃভ্রমণের সময়। বেণীবাবুর হার্ডওয়ারের কারবার। তিনি ওকে দেখে কাছে এলেন, কথা বললেন। বুঝে নিলেন দামী জিনিস। হাতছাড়া করা যাবে না। রোবু সহজভাবেই সব উত্তর দিল। তবে তাঁর সঙ্গে যেতে রাজী হল একটা শর্তে, যদি তাকে একবার কি দুবার ফোন করতে দেওয়া হয়, তবেই।

এ আর এমন কি। আমার বাড়িতে ফোন আছে, তুমি যাকে ইচ্ছা ফোন করতে পার, তবে পুলিশকে নয় কিন্তু। পরদিনই কাগজের খবর চোখে পড়েছে তাঁর—'এ লাভলি ইয়ং রোবট মি সং'।

রোবু ফোন করল হিঙ্গোরানীর বাড়িতে, নম্বর দেখা, ডায়াল করা সবই বেণীবাবুর কাজ। ওপার থেকে উত্তর এলো, হ্যালো, কাকে চাই ?

লাভলিকে একটু দেবেন ?

সে যে এখন ম্যাথ করছে—

আপনি কে বলছেন ?

আমি ওর নতুন আন্টি।

রোবু ফোন রেখে দিল, যেন হতাশ। কিন্তু বেণী-শঙ্কর চালাক লোক। তিনি সেই দিনই বাড়তি খরচ করে একটা ফার্স্ট ক্লাস সীট বুক করলেন এলাহাবাদের। ট্রেনের মধ্যে কথায় কথায় রোবুকে জাগিয়ে রাখা বা ঘুম পাড়ানোর সুইচ দুটোর খবরও জেনে নিয়েছেন।

এদিকে লাভলি পরীক্ষায় ফেল করল। পড়ায় তার মন নেই। মনটা সব সময়ই খারাপ। তার চিন্তা রোবুকে নিয়ে। কেন ? সে কি করেছিল ? মামুমী কেন দিয়ে এল তাকে ? একথা বললেই, মায়ের উত্তর, আমি যা ভাল বুঝেছি তাই করেছি।

মিঃ হিঙ্গোরানীর মনটাও ভেঙে গেছে মেয়ের অবস্থা দেখে। ব্যবসার অনেক কাজে এখন তাঁর ভুল হয়ে যায়, ক্ষতিও হয়।

একদিন স্ত্রীকে বললেন, উষা, চলো না আমরা কোথাও বেড়িয়ে আসি। লাভলির মনটাও ভাল হবে। চলো, যাওয়া যাক, স্ত্রীর উত্তর এল।

বোম্বাই সহর দেখলেন দিন চারেক ধরে একটা ভাল হোটেলে থেকে। কত কি কিনে দিলেন লাভলিকে, কিন্তু তার মনের উন্নতি হল না। তারপর ওঁরা এলেন বেনারসে। এখানে বোটে চড়ে গঙ্গার উপর দিয়ে অনেক বেড়ানো হল।

মিসেস হিঙ্গোরানী বললেন, আমাদের ত কলকাতায় ফিরতেই হবে। যাবার পথে এলাহাবাদ হয়ে যাই চল। ওখানে আমার বোনের বাড়ি। লাভলি যে কিছুই এনজয় করছে না এটা তার বাবার চোখ এড়ায় নি।

আবার বাঁধাছাঁদা শুরু হল। এলাহাবাদে দিন দুই

থাকার পর ওরা একদিন সঙ্গমে স্নান করতে গেল। কী অপূর্ব দৃশ্য। লাভলি তার মাসীর হাত ধরে দাঁড়িয়ে, ওরা স্নান করে এলেন। কাপড় ছেড়ে গাড়িতে উঠলেই হল। গাড়িটা আবার ছিল রাস্তার অন্য পারে পার্ক করা।

লাভলি বাহাদুরি করে নিজে আগে গিয়ে গাড়িতে উঠবে। মাসীর হাত ছেড়ে সে তীর বেগে ছুটল। রাস্তা ক্রস করার সময় সে দেখেইনি একটা ছুটন্ত ট্রাক আসছে। তাকে চাপা দেয় দেয়—মিসেস হিঙ্গোরানী চিৎকার করে উঠেছেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে কে যেন ছুটে এসে লাভলির হাত ধরে টেনে আনল। লাভলি প্রায় পড়ে গেছিল। উঠে তাকিয়ে দেখে—এ কি! এ যে রোবু! সেও যে এসেছিল বেণীবাবুর চাকরের সঙ্গে এরা কেউ তা জানত না।

ওরকম করে কি রাস্তা পার হতে হয় ?—রোবু বলে ওঠে।

লাভলি বলল, কি করব, আমি কি দেখেছি—কিন্তু রোবু, তুমি এখানে এলে কি করে, তাই বল।

রোবু বলল, সে আমি পরে বলছি। তুমি না

কলকাতার মেয়ে। রাস্তা পার হতে জান না, ছি ছি— ভাগ্যিস আমি দেখেছিলুম।

লাভলির মুখে হাসি, সে বলল, রোবু, কই তোমায় ত একটু আগে আমি দেখতে পাইনি।

মিঃ হিঙ্গোরানী আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই গাড়ি ছেড়ে সেখানে এসে দেখেন ভিড় জমে গেছে। সবাই রোবুর প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। হাসি হাসি মুখে লাভলি বলল, ড্যাডি, হিয়ার ইজ মাই রোবু।

মিঃ হিঙ্গোরানী বললেন, ঐ রোবট আমাদের। আমি ওকে কিনেছি, সে কনট্রাক্ট এখনও শেষ হয়নি। আমি টাকাও ফেরৎ নিইনি। এ কেস আমি পুলিশে জানাবো। কলকাতায় কেমন ব্যবসা কর তুমি আমি দেখিয়ে দেব—

না না—দয়া করে পুলিশে জানাবেন না, আমার সর্বনাশ করবেন না, প্লীজ।

মিঃ হিঙ্গোরানী বুঝিয়ে দিলেন, রোবুর সমস্ত স্বত্ব তাঁর এবং প্রোফেসারের। আমি ওকে এখন নিয়ে যা চ্ছি—

হিঙ্গোরানী সত্যি অবাক হয়ে বললেন, তুমি কলকাতা থেকে এখানে এলে কেমন করে?

জবাব দিল বেণীবাবুর লোক, সে বলল, এটিকে কিনেছেন আমার মনিব। তাঁর সঙ্গেই এসেছে।

হতেই পারে না। আসলে ও যে আমাদের জিনিস। হিঙ্গোরানীর এবার চড়া গলা। কে তোমার মনিব? চলো আমরা সবাই তার বাড়িতে যাব।

রোবু বলল, তিনি আমাকে রাস্তা থেকে নিয়ে গেছেন তার বাড়িতে। তারপর ট্রেনে এসেছি ঝিক—ঝিক—ঝিক ঝিক করে—

বেণীশঙ্কর অনেক কথার পর ভয় পেয়ে গেছেন। তাঁকে স্বীকার করতে হল যে ওকে লুকোবার জন্যেই কলকাতা ছেড়ে আসতে হয়েছে।

তারপর আর কি? রোবুকে নিয়ে লাভলিরা ফিরল কলকাতায়। লাভলির মায়ের মনটা একেবারে বদলে গেছে। তিনি বললেন, আমি যে দেখেছি। চোখের সামনে দেখেছি গো। ভাগ্যিস ও ছিল নয়ত আমার মেয়ের যে কি হত ভগবান!

মিঃ হিঙ্গোরানী বললেন, কিন্তু প্রোফেসারকে ত ফিরিয়ে দিতে হবে।

না। ওকে আবার ফিরিয়ে দেব, লাভলির মায়ের চোখে জল, আমি এত বড় অকৃতজ্ঞ নই গো। ও থাকবে আমার বাড়িতে।

লাভলি ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে স্নেহ মধুর কণ্ঠে বলল, মামুমী, হাউ গুড্ ইউ আর!

গ্রহাণু

মৃন্ময়ী দাস

সৌরমণ্ডলের গ্রহগুলির পারস্পরিক দূরত্বের তুলনায়, মহাকাশে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যেকার ফাঁকটি যেন বড় বেশি। অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গণনা অনুযায়ী এতটা স্থান ফাঁকা থাকার কথা নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বেশ কিছু বিজ্ঞানী ওই অঞ্চলে গ্রহের সন্ধান করতে থাকেন। 1801 সালের 1লা জানুয়ারী ইতালীর গাণিত ও জ্যোতির্বিদ গিসেপে পিয়াজি মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আকারের গ্রহ আবিষ্কার করলেন। গ্রহটির নাম দেওয়া হল সিরেস। এর ব্যাস মাত্র 770 কিলোমিটার। 1807 সালের মধ্যে আরও তিনটি এই রকম ক্ষুদ্র গ্রহ পালাস। (ব্যাস 484 কি.মি.), জুনো (ব্যাস 193 কি.মি.) এবং ভেস্ট (ব্যাস 386 কি.মি.) আবিষ্কৃত হয়। 1845 সালে পঞ্চম ক্ষুদ্র গ্রহের সন্ধান পাওয়া গেল। 1890 সালের মধ্যে 300টি, 1968 সালের মধ্যে 1660 এবং 1977 সালের মধ্যে 2042-টি এইরকম গ্রহ আবিষ্কৃত হল ওই একই অঞ্চলে। বিজ্ঞানীদের মতে, এরা মহাকাশে বিচরণরত অসংখ্য ক্ষুদ্র গ্রহের সামান্য অংশমাত্র এবং এদের সৃষ্টি সুদূর অতীতে বড় বড় গ্রহের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে। এদের নাম দেওয়া হল অ্যাস্টরয়েড বা গ্রহাণু।

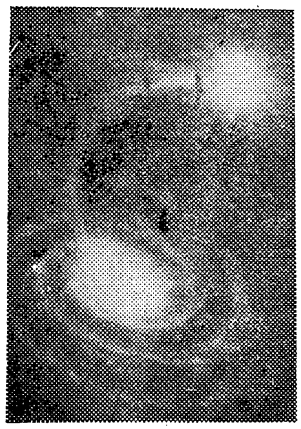

গ্রহাণুগুলিও গ্রহের মত নিজ নিজ কক্ষপথে সূর্যের চারদিকে ধীরগতিতে আবর্তন করে চলেছে। এদের কক্ষপথ স্বল্প উৎকেন্দ্র বিশিষ্ট উপবৃত্তাকার। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যেকার এই অংশটি যেন একটি সীমান্তরেখা যার ভিতরের দিকের অন্তর্গ্রহগুলির ঘনত্ব বেশি এবং বাইরের দিকে বহির্গ্রহগুলিতে গ্যাসীয় ভাগ বেশি হওয়ায় ঘনত্ব কম। মোট গ্রহাণুর শতকরা প্রায় 95 ভাগ এই অঞ্চলে থাকায় এই অঞ্চলটিকে বলা হয় গ্রহাণুবন্ধনী। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে এই গ্রহাণুবন্ধনী অন্ততপক্ষে 50টি 80 থেকে 800 কিলোমিটার ব্যাসসম্পন্ন সৌরবস্তুর পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে টুকরো হয়ে যাওয়া বস্তু দিয়ে তৈরি হয়েছে। সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত চারটি গ্রহাণু আকারে সবচেয়ে বড় হওয়ায় তাদের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমে আলোর থালার মত দেখা যায়। অন্য গ্রহাণুদের দেখায় আলোকবিন্দুর মত। চাঁদের ভূপৃষ্ঠের মতই এদের রঙ ও আলোক প্রতিফলন ও বিচ্ছুরণের ক্ষমতা। বর্ণালীবীক্ষণের সাহায্যে এইসব গ্রহাণুপৃষ্ঠে অন্তত 12 রকমের পাথরের অস্তিত্ব ধরা পড়েছে। জানা গেছে, গ্রহাণুদের শতকরা প্রায় 88 ভাগই কার্বন দিয়ে তৈরি, এদের রঙ কালচে। উজ্জ্বল গ্রহাণুগুলি প্রধানত সিলিকা বা বালি জাতীয় বস্তু দিয়ে তৈরি, কিছু কিছু লাল রঙের গ্রহাণু আবার লোহা দিয়ে তৈরি। কেন্দ্রে লোহা, তার ওপর সিলিকার স্তর এবং সবার ওপরে কার্বন, সম্ভবত এইভাবেই গ্রহাণু গঠিত ছিল। সংঘর্ষের ফলে কখনও কার্বন আবার কখনও বা সিলিকা স্তর নষ্ট হয়ে যায়।

14টি গ্রহাণুর ব্যাস 100 কিলোমিটারের কিছু বেশি, 300টির 30 কিলোমিটার এবং 2000টি 17 কিলোমিটারের বেশি। প্রায় 30 লক্ষ গ্রহাণুর ব্যাস এক কিলোমিটার 10^{12} টি গ্রহাণুর ব্যাস 7 মিটারের সামান্য বেশি। ছোট ও মিটমিটে গ্রহাণুই সংখ্যায় বেশি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এদের সমবেত ভর কিন্তু মঙ্গলের ভরের শতকরা 3 ভাগের মত হবে।

গত 30 বছরে উচ্চগতিসম্পন্ন ইলেকট্রনিক কমপিউটারের সাহায্যে অনেক গ্রহাণুর কক্ষপথ সঠিকভাবে জানা গেছে। কক্ষপথ জানার সঙ্গে সঙ্গে গ্রহাণুগুলিকে এক একটি স্থায়ী সংখ্যায় চিহ্নিত করা হয়, এবং নামকরণও করা হয়। যেমন সব থেকে বড় গ্রহাণু সিরেসের সংখ্যা 1,পালাসের 2, জুনোর 3 এবং ভেস্টার 4। এইভাবে 1977 সালে গ্রহাণু 2042-এর কক্ষপথ আবিষ্কার করা হয়েছে। আরও প্রায় 2000টি অপেক্ষাকৃত বড় গ্রহাণুর কক্ষপথ এখনও আবিষ্কার করা যায় নি বলে অনুমান করা হয়। একই ধরনের কক্ষপথ-সম্পন্ন গ্রহাণুদের আবার একই পরিবারভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। মোট গ্রহাণুর প্রায় এক তৃতীয়াংশ এই রকম বিভিন্ন পরিবারভুক্ত। দশটি প্রধান পরিবার লক্ষ্য করা যায়। যেমন ট্রোজান 7 রিবারের গ্রহাণুগুলি বৃহস্পতির কক্ষ-পথের অনেকটা জুড়ে আছে। 16টি প্রধান ও বেশ কয়েক হাজার অস্পষ্ট ট্রোজান গ্রহাণু দেখা যায়। এদের রঙ খুবই কালো, সৌরযুগের আদিমকালের পাথরের অস্তিত্ব এগুলির মধ্যে পাওয়া সম্ভব বলে মনে করা হয়। হিরাশ, অ্যাপোলো, আমোর প্রভৃতি আরও গ্রহাণু পরিবার আছে

[শেষাংশ 44 পৃষ্ঠায়]

[চার]

বন থেকে বেরোলো বর্বর

'মেয়ে বর্বর', বলেছিলাম আমি, 'নিউগিনি অথবা আফ্রিকার জঙ্গলে যেমন আছে, ঠিক তেমনি।'

দৃঢ় বিশ্বাস নিয়েই বলেছিলাম কথাটা। প্রতিবাদ করেছিল আর্থার ছোকরা। আদিম বর্বর মেয়েরা কখনই এমন অপরূপা হয় না। এমন লাবণ্যময়ী হয় না। ভুল মোটেই বলেনি, হাজার বার তা বলব। প্রফেসর কিন্তু চিন্তায় ডুবে আছেন। আমাদের কথা কাটাকাটিতে কান নেই।

অবশেষে বললেন—'যত আদিমই হোক না কেন, কথা বলার ভাষা তো একটা থাকবে। এ মেয়ে তো কথাই বলতে পারে না।'

ঝর্ণার আশে পাশে খুঁজলাম। কিন্তু মেয়েটার চিহ্নও দেখতে পেলাম না। ফিরে এলাম চত্বরের মাঝে লঞ্চের কাছে। অন্য কোথাও ফের লঞ্চ নামাতে চেয়েছিলেন প্রফেসর। আরও সভ্য প্রাণী দেখবার আশায়। আর্থার বলেছিল, এই জায়গাটাই আগে ভাল করে দেখা হোক—অন্ততপক্ষে চব্বিশটা ঘণ্টা থাকা হোক—তারপর যাওয়া যাবে অন্য কোথাও।

সায় দিয়েছিলাম আমিও। জঙ্গলের ভেতরে কি আছে, না দেখে চলে যাওয়াটা ঠিক হবে না।

বিকেলটা বিনা ঘটনাতেই কেটে গেল। সন্দে নাগাদ বেটেলগুজের দিগন্তরাঙানো অভূতপূর্ব সূর্যাস্ত দেখছি তন্ময় হয়ে, এমন সময়ে কি যেন একটা পরিবর্তন দেখা দিল আশে পাশে। জীবন্ত হয়ে উঠল যেন জঙ্গল। ছোটখাট ডাল-পালা ভাঙার শব্দ, পাতা সরিয়ে নড়াচড়ার শব্দ ভেসে এল কানে। কেমন জানি মনে হল, অসংখ্য চোখ অদৃশ্য থেকে নজর রাখছে আমাদের ওপর।

নির্বিঘ্নে কাটল রাত। পালা করে তিনজনে পাহারা দিলাম লঞ্চ।

ভোর হল। আবার অণু-পরমাণুতে জাগ্রত হল অস্বস্তিকর সেই অনুভূতি। সেই সঙ্গে আমার অন্তত মনে হল কারা যেন তীক্ষ্ন চিৎকার করছে বনের মধ্যে। ঠিক এই রকমভাবে চিৎকার করতে শুনেছিলাম নোভাকে।

অনেক উদ্ভট ব্যাপারই কল্পনা করে বসেছিলাম সেই মুহূর্তে। কিন্তু কেউই এল না বনের বাইরে।

সাহসে বুক বেঁধে ফের গেলাম ছোট্ট প্রপাতটার ধারে। যাওয়ার পথে স্পষ্ট টের পেলাম, আড়াল থেকে কারা যেন দেখছে আমাদেরকে। কিন্তু সামনে আসছে না। এমন কি নোভাও আড়ালে রেখে দিয়েছে নিজেকে।

আর্থার বললে—'খুব সম্ভব ভয় পাচ্ছে আমাদের গায়ের জামাকাপড় দেখে।'

কথাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। শিল্পাঞ্জী বেচারাকে গলা টিপে মেরে ফেলার পর যখন পালাচ্ছে নোভা, চোখ পড়েছিল তার স্তূপ করে রাখা আমাদের জামাকাপড়ের ওপর। সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে গেছিল দূরে।

তাই বললাম—দেখা যাক।

বলে, জামাকাপড় খুলে রেখে, শুধু অন্তর্বাস পরে ঝাঁপ দিলাম লেকের জলে। এমনভাব করে রইলাম তিনজনেই, যেন নজর নেই কোনদিকেই—স্নান নিয়ে ব্যস্ত।

কাজে লাগল কৌশলটা। মিনিট কয়েক পরেই দেখলাম পাথুরে চাতালে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটা, একা নয়। পাশে দাঁড়িয়ে একটা পুরুষমূর্তি। অবিকল পৃথিবীর পুরুষ-মানুষের মতই। কোমর ঘিরে গাছের ছাল—এই তার

পোশাক। নোভার সঙ্গে চেহারার আদল রয়েছে। বাবা নিশ্চয়। দুজনেই একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। ভয়-ভয় ভ্যাবাচাকা চাহনি দুজনেরই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল আরও অনেককে। আমরা কিন্তু এমন ভান করে গেলাম, যেন দেখতেই পাইনি। জঙ্গল থেকে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এসে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে গেল লেক ঘিরে। দেখতে সুন্দর প্রত্যেককেই। প্রত্যেকেরই গায়ের রঙ সোনালী। অবিকল মানুষের মতই আকৃতি। চাপা উত্তেজনায় মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে গলা ছেড়ে, তীক্ষ্ন স্বরে।

শঙ্কিত হলাম। শিম্পাঞ্জীর হাল হবে না তো আমাদের? কিন্তু ভয় ধরানো ভাবসাব তো দেখছি না এখনও। শুধু যা বিষম কৌতূহলে ফেটে পড়ছে আমাদের চেহারা দেখে।

একই চেহারা যখন, তখন আর ভয় কী? যেন এই ভেবেই নোভা আস্তে আস্তে নামল জলে। পেছন পেছন এল অনেকে। আগের দিন যেমন নোভার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলাম লুকোচুরি খেলে, তেমনি খেলা খেলে গেলাম প্রত্যেকের সঙ্গে। কখনো সাঁতরে গিয়ে ধরতে যাই, ওরা পালায়। কখনো ওরা এগিয়ে এলে, আমরা পালিয়ে আসি। জনা কুড়ি বিচিত্র প্রাণীর সঙ্গে চলল এই ছেলে-মানুষী জলক্রীড়া।

মিনিট পনের পরে ক্লান্ত বোধ করলাম। বেটেলগুজের বিশ্বে এসেছি কি স্কুলের ছেলেমেয়েদের মত ছেলেমানুষী করব বলে? বিচ্ছিরি লাগল আমার। কিন্তু প্রফেসর খুব মজা পেয়েছেন দেখলাম। আর কিছু করারও তো নেই। হাসতে যারা জানে না, কথা বলতে জানে না—তাদের সঙ্গে ভাব বিনিময় কি সম্ভব?

তা সত্ত্বেও চেষ্টা করেছিলাম আমি। হাত নেড়ে ইসারায় অনেক কথা বলতে চেয়েছিলাম। আমরা যে বন্ধু, তা বোঝাতে কসুর করিনি। কিন্তু ওদের কারোর চোখেই ঝিলিক দেখিনি—বুঝতে পেরেছে বলে মনেই হয় নি।

পৃথিবী থেকে আসবার সময়ে মহাকাশ জাহাজে বসে জল্পনাকল্পনা করেছিলাম, না জানি কি বিদঘুটে প্রাণীই দেখব নতুন নতুন গ্রহে। চেহারার দিক দিয়ে একেবারেই অন্য রকম। হয়ত দৈত্যের মতন। কিন্তু মন বলে একটা

জিনিস থাকবেই, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই ছিল না।

সোরোর গ্রহে দেখছি কিছুই মিলছে না কল্পনার সঙ্গে। একেবারে উল্টো আমাদের মতই দেখতে এদের, কিন্তু যুক্তি বুদ্ধির বালাই একেবারেই নেই। নোভার চোখে মুখে এই জিনিসটার অভাব দেখেই বিচলিত হয়েছিলাম। এখন দেখলাম সবাই একই শক্তির প্রসাদে বঞ্চিত—এ শক্তির নাম মেধাশক্তি।

আগ্রহ শুধু খেলাতেই। তাও নিরেট বোকাদের খেলা! তিনজনে হাত ধরাধরি করে কোমরজলে গোল হয়ে দাঁড়ালাম। বাচ্চাদের মত হাত ওঠানামা করতে লাগলাম। ধড়ফড় করে দূরে সরে গেল ওরা। চেয়ে রইল একদৃষ্টে। কিছুই যে বুঝতে পারেনি, তা চোখমুখ দেখেই বুঝলাম। হতভম্ব হলাম সেই কারণেই।

তারপরেই দমকা হাসিতে ভেঙে পড়লাম। পৃথিবী থেকে একটা পথ পাড়ি দিয়ে তিন তিন জন বয়স্ক মানুষের ছেলেমানুষী কাণ্ডের কথা ভাবতে গিয়েই হাসি যেন পেট ফেটে বেরিয়ে এল। তিনজনের মধ্যে একজন আবার পৃথিবী বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক। হাত ধরাধরি করে জল নিয়ে খেলছি কোমর জলে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণ যে হাসিনি, এই যথেষ্ট। তাই শুরু যখন হল, থামাতে পারলাম না কিছুতেই।

পরিণামটা হল অদ্ভুত। যেন ঝড় বয়ে গেল আশে-পাশে। জল তোলপাড় করে ওরা ধেয়ে গেল পাড়ের দিকে। ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল জল থেকে। ক্রুদ্ধ চিৎকারে আকাশ-বাতাস ফালা ফালা করে হাত বাড়িয়ে দেখাতে লাগল আমাদের।

অট্টহাসি জিনিসটা সচরাচর সংক্রামক হয়। কিন্তু এদের দিল রাগিয়ে। সেই রাগ আর অঙ্গভঙ্গি দেখে শঙ্কিত হয়ে কোমরের আগ্নেয়াস্ত্রে হাত দিয়েছিলাম। বাধা দিল আর্থার। আক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত ও জিনিসটা এদের না দেখানই ভাল।

পাড়ে উঠলাম। জামাকাপড় পরবার সময়ে আরও ক্ষেপে গেল অদ্ভুত মানুষগুলো। ভয়ের চোটে জনাকয়েক পালিয়ে গেল দৌড়ে। অন্যরা দুহাত সামনে বাড়িয়ে এগিয়ে এল আমাদের দিকে। বুদ্ধি যাদের এত মোটা, তারা জামাকাপড় দেখলে এরকম করে কেন? বিশেষ করে কোমরের আগ্নেয়াস্ত্র টেনে বার করতেই আগুয়ান লোকগুলো টেনে লম্বা দিল কেন?

রহস্য। সত্যিই রহস্য!

রওনা হলাম লঞ্চের দিকে। বেশ বুঝলাম, আড়াল থেকে ওরা দেখছে আমাদের।

খোলা চত্বরে পা দিতে না দিতেই দল বেঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের ওপর। এত আচম্বিতে যে অস্ত্র বার করার সুযোগও পেলাম না।

চড়াও হল ঠিকই, কিন্তু প্রাণে মারল না আমাদের—নোভা যেমন নিমেষ মধ্যে গলাটিপে মেরে ফেলেছিল শিম্পাঞ্জী হেকটরকে—আমাদেরকেও পরলোকে পাঠাতে পারত সেইভাবে।

কিন্তু ওদের যত আক্রোশ দেখা গেল আমাদের জামা-কাপড় আর অস্ত্রশস্ত্রের ওপর। টান মেরে গা থেকে ছিঁড়ে ফেলল প্রত্যেকের পোশাক—ছিঁড়ে ফালা ফালা করে ফেলল চোখের পলকে। ছুঁড়ে ফেলে দিল অস্ত্রশস্ত্র। কৌপিনের মত শুধু জাঙ্গিয়াটুকু রইল পরনে।

দেখে খুশি হল অস্বাভাবিক এই আগন্তুকরা। হাত ধরাধরি করে আমাদের চারপাশে নাচতে লাগল ধেই ধেই করে। কিন্তু এত নিবিড়ভাবে যে ফাঁক দিয়ে গলে গিয়ে লঞ্চের দিকে ছুটে যাওয়ার উপায় রইল না।

জঙ্গল থেকে চত্বরে জড়ো হয়েছে প্রায় শ'খানেক মানুষের মত চেহারা নিয়ে অমানুষেরা। অমানুষ ছাড়া আর কি-ই বা বলব? আমাদের জামাকাপড় ছিঁড়ে আর অস্ত্রশস্ত্র ছুঁড়ে ফেলে দেবার পর দৌড়ে গেল লঞ্চের দিকে। একই ঘটনা ঘটল সেখানেও। গায়ের ঝাল দেখলাম শুধু মানুষের হাতে তৈরি জিনিসপত্রের ওপর। অস্ত্রশস্ত্র, যন্ত্রপাতি—যা কিছু পাচ্ছে হাতের কাছে, তাই নিমেষ মধ্যে ভেঙে মুচড়ে দুমড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে—আবার ছুটে গিয়ে ভাঙা জিনিসটাকেই তুলে নিয়ে আরও ভাঙছে, আবার আছাড় মারছে। বিপদ যেন এখনও কাটেনি। বেড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে কামড়াকামড়ি করে বার বার, অথবা নেউল যেমন সাপ মেরেও ছিনিমিনি খেলে মরা সাপকে নিয়ে এরাও তেমনি অপরিসীম ধ্বংস করে চলেছে যা কিছু হাতে গড়া। কোনো অস্ত্রও নেই এদের হাতে—এমন কি গাছ থেকে ভেঙে আনা ডালও নেই। খালি হাতেই চড়াও হয়েছিল আমাদের ওপর—এখন হল লঞ্চের ওপর।

লঞ্চের দরজা ভেঙে পড়ল গুঁতোগুঁতিতে। ঢুকে গেল ভেতরে। তছনছ হয়ে গেল দামি দামি যন্ত্রপাতি। অটুট রইল কেবল লঞ্চের বাইরের খোলসটা। ফিরে এল আমাদের কাছে। ঠেলে ঠুলে নিয়ে গেল জঙ্গলের ভেতরে।

অবস্থা আমাদের শোচনীয়। ধাক্কায় ধাক্কায় প্রাণ বেরিয়ে যায় আর কি। কথা বলতে গেলেই মারতে আসছে। মুখ বুজে রইলাম সেই ভয়ে। কি রকম মানুষ এরা? বাইরে থেকে অবিকল আমাদের মতই। মেয়েরা আমাদের মেয়েদের চাইতেও সুন্দরী। সব চাইতে সুন্দরী নোভা। কিন্তু মন বলে কি কিছুই নেই এদের? বেশ কয়েকবার ওর চোখের দিকে চেয়েছিলাম করুণ চোখে—প্রতিবারেই চোখ ঘুরিয়ে নিয়েছে নোভা—যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে যাচ্ছে চোখে চোখ রাখলেই।

বেশ কয়েক ঘণ্টা ধরে জঙ্গল ঠেলে চলতে হল এইভাবে। নিরেট জঙ্গল, পা কেটে রক্তারক্তি, রক্ত ঝরছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু

নিস্তার নেই। দুর্ভেদ্য এই জঙ্গলে গা বাঁচিয়ে চলতে বেশ অভ্যস্ত মানুষের মত এই প্রাণীরা। অবস্থা কাহিল হল আমাদের।

অবশেষে পৌঁছোলাম ফাঁকামত একটা জায়গায়। জঙ্গল এখানে তত ঘন নয়। পায়ের তলায় ঘাস। আমাদের ছেড়ে দিয়ে নিজেদের মধ্যে ছুটোছুটি খেলা আরম্ভ করল বিচিত্র প্রাণীরা। যেন খেলা করাই ওদের একমাত্র কাজ। আমরা এলিয়ে পড়লাম ঘাসের ওপর।

পালাতে পারতাম। কিন্তু পালিয়ে যাব কোথায়? লঞ্চের দফারফা হয়ে গেছে। এদিকে পেটে আগুন জ্বলছে। রাত হতে দেরি নেই। একটা গাছের তলায় কয়েকজন একটা হরিণকে দাঁত দিয়ে কামড়ে ছিঁড়ে কাঁচাই খাচ্ছিল। আগুনে সেঁকে খাওয়ার ব্যাপারই নেই। আগুন কোথায় গুটি গুটি এগিয়েছিলাম সেদিকে। এমন দাঁত বার করে রুখে দাঁড়াল যে সরে এলাম ভয়ে ভয়ে।

নোভা বোধ হয় বুঝেছিল আমাদের ক্ষিদে পেয়েছে। সড় সড় করে উঠে গেল গাছে। পায়ের কাছে ফেলল কয়েকটা ফল। অনেকটা কলার মত দেখতে। নিচে এসে একটা খেল আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে। খেলাম আমরাও। ভালই খেতে। কাছেই জল পেলাম—ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে ঝর্ণার মত। খেলাম পেট ভরে।

এবার ঘুমের পালা। বিচিত্র লোকগুলো শুয়ে পড়েছে। আফ্রিকায় নরবানররা যেভাবে বাসা বানিয়ে নেয় ডালের মধ্যে ডাল গলিয়ে, বাঁধে না—শুধু গলিয়ে রাখে—পাতে মাটির ওপর অথবা গাছের ওপরেই—যেখানে একটা শাখা থেকে আরেকটা শাখা বেরিয়েছে। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে এই রকম বাসায় শুয়ে পড়েছে সকলে। ছোটদের স্বাস্থ্যও দেখবার মত—দেবশিশুর মত সুন্দর।

প্রফেসরের নাক ডাকছে শুনলাম। মাথার ওপর দেখলাম পৃথিবীর চাঁদের চাইতেও ছোট আর ম্যাড়মেড়ে চাঁদ—হলদেটে আলো। ঘুমিয়ে পড়লাম। [ক্রমশঃ]

[40 পৃষ্ঠার পরবর্তী অংশ]

সম্ভবতঃ অতীতে কোনও সময়ে দুটি অপেক্ষাকৃত বড় গ্রহাণুর সংঘর্ষের ফলে টুকরো হয়ে এক একটি গ্রহাণু পরিবারের সৃষ্টি।

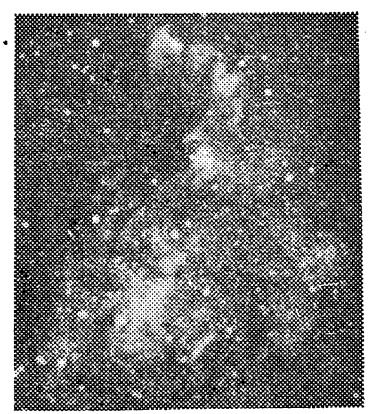

গ্রহাণুগুলির ঔজ্জ্বল্য সবসময়ে একরকম থাকে না। মাত্র কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে এরা উজ্জ্বল হয় ও আবার মিটমিট করে। এর কারণ, এরা আকারে গোল নয়, লম্বাটে। সুতো কাটা। টাকুর মত ঘুরতে ঘুরতে এরা মহাকাশে বিচরণ করছে। চওড়া দিকটা আমাদের সামনে এলে এদের উজ্জ্বল দেখায়, সরু দিকটা এলে ঔজ্জ্বল্য কমে যায়। 1931 সালে গ্রহাণু 433-এরোস যখন পৃথিবীর খুব কাছ দিয়ে যাচ্ছিল তখন তার লম্বাটে আকার দৃশ্যমান হয়, এটি প্রায় 22 কিলোমিটার লম্বা ও 6 কিলোমিটার চওড়া। গ্রহাণুদের এই অসম আকার, গ্রহের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে টুকরো হয়ে গ্রহাণু সৃষ্টিতত্ত্বের অন্যতম প্রধান প্রমাণ। এই ধরনের সংঘর্ষ প্রায়শঃই ঘটে।

পোলিশ জ্যোতির্বিদ পিট্রোস্কির মতে প্রতিটি গ্রহাণু কয়েক লক্ষ বছরে পারস্পরিক সংঘর্ষে কিছুটা ভর হারাচ্ছে। গ্রহাণুবন্ধনী যেন দৈত্যাকার এক যাঁতাকল, যা গ্রহাণুদের ক্রমাগত পিষে ছোট করে চলেছে। এইভাবে প্রতিবছর মহাকাশে কয়েক কোটি টন ধুলো, বালি, ও নুড়ি তৈরি হয়ে চলেছে। এই পেষণ ও চূর্ণন আরম্ভের আগে গ্রহাণুসংখ্যা কত ছিল তা জানার কোনও উপায় নেই। কারোর কারোর মতে, সৃষ্টির সময়ে সৌরজগতে হয়ত মাত্র কয়েকশত গ্রহাণু ছিল। অন্য গ্রহাণুর সৃষ্টি গ্রহ ও গ্রহাণু ভেঙে। বর্তমানে খুব কম গ্রহাণুই অক্ষত অবস্থায় আছে। 4-ভেস্টা এমনই একটি গ্রহাণু।

সৌরজগৎ সৃষ্টির সময়কার আদিম গ্যাস ও ধূলিকণা কোনও কোনও গ্রহাণুতে আজও অক্ষত অবস্থায় আছে বলে মনে করা হয়। এইসব গ্রহাণুতে অভিযান চালিয়ে সৌরজগৎ সৃষ্টির সময়ের তথ্য আরও অনেক বেশি ও সঠিক-ভাবে জানা সম্ভব।

অগ্রজ রসায়নবিজ্ঞানী প্রফুল্লচন্দ্র

জয়ন্ত মণ্ডল

বর্তমান 1986 সাল দুজন মহান মনীষীর একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী, একজন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অপরজন ডক্টর অব সায়েন্স, দেশসেবক ও রসায়নবিদ প্রফুল্লচন্দ্র রায়। উভয়েই প্রায় সমসাময়িক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের যুগে বাংলাদেশের খুলনা জেলার কপোতাক্ষ তীরে রাড়ুলি-কাঠি-নাড়া গ্রামে এক জমিদার কায়স্থ পরিবারে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 1861 সালের 2রা আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন ; তিনি পিতার তৃতীয় পুত্র।

নয় বৎসর পর্যন্ত গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি পিতার সঙ্গে কলকাতায় এসে প্রথমে হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন, তারপর মেট্রোপলিটন ও আলবার্ট স্কুলে তারপর মেট্রোপলিটন থেকে 1879 খ্রীস্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

গিলক্রাইস্ট বৃত্তিলাভ করে তিনি উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে B. A. পড়াকালে 1887 খ্রীস্টাব্দে 27 বৎসর বয়সে বিলাত যাত্রা করেন।

বিলাতে স্কটল্যান্ডের এডিনবরা শহরে অধ্যাপক ক্রামব্রাউনের অধীনে রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণা করে ডি. এস-সি. উপাধি লাভ করেন (1888 খ্রীঃ)।

বিদেশ ভ্রমণ পরিশেষে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

1915 খ্রীস্টাব্দে কলিকাতায় বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় পালিত অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন এবং বিজ্ঞান-চর্চা ও বিজ্ঞানে গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান চর্চার প্রতি ছাত্রদের শ্রদ্ধাপূর্ণ কৌতূহল জাগ্রত করার জন্য তিনি পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদের পাশে চরক, সুশ্রুত, নাগার্জুন, আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য, বরাহমিহির প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের উল্লেখ করতেন।

অতীত ভারতের বিজ্ঞান সাধনা সম্বন্ধে গবেষণা করে তিনি হিন্দু রসায়নের ইতিহাস রচনা করেন। তারই উৎসাহে একদল নব্য রাসায়নিক সৃষ্টি হয়। এঁদের মধ্যে ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ জ্ঞানেন্দ্র মুখার্জী, ডঃ নীলরতন ধর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

Socrates এর পরিচয় যেমন Plato, শ্রীরামকৃষ্ণের পরিচয় যেমন বিবেকানন্দ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পরিচয় তেমনি ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, ডঃ জ্ঞানেন্দ্র মুখার্জী ডঃ নীলরতন ধর, মেঘনাদ সাহা, পঞ্চানন নিয়োগী ও সত্যেন্দ্রনাথ বসু। 1916 খ্রীস্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর ছাত্রদের মধ্যে বহু হয়েছেন, নিজের চিত্তকে সঞ্জীবিত করেছেন বহুর মধ্যে। অসাধারণ পরিশ্রম করে তিনি হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের গোপন তথ্য উদ্ধার করেন। 1895 খ্রীস্টাব্দে (সর্বপ্রধান মার্কিউয়াস নাইট্রেট) পারদ ঘটিত নূতন তেরটি যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করেন সারা বিশ্বে তিনি ভারতের গৌরবকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

তারই উৎসাহে 1901 সালে প্রথম 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' নামক এক বিরাট ঔষধ প্রস্তুতকারক ভেষজ প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে (1911 খ্রীঃ) ব্রিটিশ সরকার 'সি. আই. ই.' এবং (1920 খ্রীঃ) 'নাইট' উপাধি দান করেন।

ঢাকা, ডারহম, কলিকাতা ও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে গৌরবাথ'ক ডি. এস-সি উপাধি দেন।

(1920 খ্রীঃ) ভারতীয় বিজ্ঞান সভায় ও (1910 খ্রীঃ) রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন এবং (1913 খ্রীঃ) মিউনিক শহরে ডয়টমে অকাদেমি ও (1934 খ্রীঃ) লণ্ডন কেমিক্যাল সোসাইটি তাঁকে প্রথম চারি বৎসর ব্যাপী প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি নির্বাচন করেন।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় চাকরীকে অপছন্দ করতেন কারণ তাঁর কাছে এটা দাসবৃত্তি মনে হত, যার ফলে তিনি প্রত্যেককে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি আগ্রহী হবার নির্দেশ দিতেন।

দেশবাসী তাঁকে আচার্য উপাধিতে ভূষিত করেন। অবশেষে সেই 1861 সালের নূতন সূর্য সারা বিশ্বে অমাবস্যার আলোকরশ্মির কিরণ দিয়ে 1944 সালে চিরবিদায় নেন। কিন্তু এ আলো নিভে যাবার নয়, এ আলো জ্বলে প্রতিদিন তবে তা সূর্যালোকের সঙ্গে মিশে যায়। আমরা সেই আলোকে অন্তঃচোখে দেখি, তাই তাঁর এই একশত পঁচিশতম জন্মবার্ষিকীতে জানাই প্রণাম ও অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা।

গরলগাছা, হুগলী

স্যাকারিন

একটি আকস্মিক আবিষ্কার

আব্দুলহক খন্দকার

তোমার মা যদি তোমাকে একটি খুব মিষ্টি আম খেতে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন—'দেখ্‌তো, আমটি কেমন মিষ্টি?' তখন তুমি জবাবে কি বলবে বলতো? যদি মধু তোমার পছন্দ, তবে খেয়ে বলবে—'আঃ! মিষ্টি যেন মধু!'—আর যদি গুড় তুমি পছন্দ কর, তবে বলবে—'উঃ! মিষ্টি যেন গুড়!'

কোনো জিনিসের মিষ্টত্ব আমরা মধু, চিনি বা গুড়ের সাথে তুলনা করি। কিন্তু গুড়,চিনি বা মধুর মিষ্টত্ব আর কতটুকু?

স্যাকারিনের নাম তোমার জানার কথা—খেয়েছও হয়তো। কিন্তু এই স্যাকারিন মধু বা চিনির চেয়ে কতগুণ মিষ্টি জান? চিনির চেয়ে এটি 450 গুণ আর মধুর চেয়ে 550 গুণ বেশি মিষ্টি।

অবশ্য মিষ্টি দ্রব্যের মধ্যে স্যাকারিনই যে সেরা তা না। এন্‌-প্রপোক্সি (N-Propoxi) নাম একটি রাসায়নিক পদার্থ বিজ্ঞানীরা প্রস্তুত করেছেন যা চিনির চেয়েও 8 হাজার গুণ বেশি মিষ্টি। কিন্তু মজার কথা কি জান? এ দুটি দ্রব্যই বিজ্ঞানীরা তৈরি করেছেন এমন এক জিনিস থেকে যা যেমন তিক্ত, তেমনি বিষাক্ত,—আবার দুর্গন্ধ যুক্তও বটে।

বলতে পার, সেটি কি? নামটি শুনলে তোমরা নাক সিটকাবে। তবু বলি, সেটি হলো আলকাতরা। আর তা তৈর হয় আবার তারই মতো কুচকুচে কালো কয়লা থেকে।

কাজেই দেখ বিজ্ঞানীরা কেমন ধাঁচের মানুষ। তাঁরা এমনই অনুসন্ধানী—এমনই দক্ষ ও কুশলী যে আলকাতরার মতো তিক্ত, বিষাক্ত ও তীব্র গন্ধযুক্ত এক দ্রব্য থেকেও তৈরি করে বসেছেন এমন সব মিষ্টি জিনিস যেগুলি তেমন বিষাক্ত নয়—খেলে দেহের বিশেষ ক্ষতি হয় না। অথচ তাদের মিষ্টত্ব চিনির চেয়েও কয়েক শত বা কয়েক হাজার গুণ বেশি। আর শুধু কি মিষ্টিদ্রব্য? ঐ কালো কুচকুচে আলকাতরা থেকেই তারা তৈরি করেছেন কত বিভিন্ন, বিচিত্র ধরনের রঙ (dye)—যা প্রকৃতির বুকেও বিরাজ করে না। আবার ঐ উগ্র, দুর্গন্ধযুক্ত আলকাতরা থেকেই তারা তৈরি করেছেন এবং করছেন এমন সব সুগন্ধি (Perfume) যাদের কণামাত্রও তৈরি হয় না প্রকৃতির কারখানায়!

ব্যাপারটা তাই বেশ মজার এবং বিস্ময়কর নয় কি? আরো বিস্ময়ের ব্যাপার হলো এ সবের মূলে রয়েছে যে জিনিসটি—সেটি হলো কয়লা—যে কয়লাকে আমরা কোনো মূল্যবান বস্তু বলে মনে করি না—তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞা করি তার কালো কুচকুচে রঙটির জন্য। অথচ, এই কালো রূপের আড়ালে যে লুকিয়ে থাকতে পারে কত বাহারে রঙ তা তুমি কল্পনাও করতে পেরেছিলে কোনো দিন? কাজেই কোনো কিছুই তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের নয়। এ কথাটা বলার জন্যেই কথায়-কথায় এতো কিছু বললাম।

যাক্‌ সে কথা! এখন স্যাকারিনের কথায় ফিরে আসি। এটি যে একটি আকস্মিক আবিষ্কার সে কথা। শিরোনামেই উল্লেখ করেছি। আরো উল্লেখযোগ্য যে আবিষ্কারের ঘটনাটি বেশ কৌতুককর, খুবই মজার!

মজার এ ঘটনাটি ঘটে 1879 সালে। হপকিনস্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আলকাতরাজাত দ্রব্য নিয়ে গবেষণা করছিলেন ফল বার্গ (Fahlberg) এবং র‍্যামসেন (Ramsen) নামে দু'জন আমেরিকান বিজ্ঞানী। তবে এখানে ফলবার্গের কথাই বলবো—কেননা তিনিই হলেন আমাদের ঐ কৌতুক-কাহিনীর আসল নায়ক!

মিষ্টি জিনিস কে না পছন্দ করে—বিশেষ করে তোমার মতো বয়স যাদের? কিন্তু বিজ্ঞানী ফলবার্গের স্বভাব ছিল একটু বিচিত্র ধরনের। মিষ্টি জিনিস বা খাবার খেতে তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। যে ভদ্রমহিলার বাসায় তিনি 'পেয়িং গেস্ট' (Paying guest) হিসেবে

বাস করতেন তাকে তিনি বিশেষভাবে বারণ করে দিয়েছিলেন তাঁর খাবারে যেন কোনো মিষ্টি ব্যবহার করা না হয়। আর মহিলাও তা করে আসছিলেন একান্ত নিষ্ঠার সাথে। কিন্তু সে সত্ত্বেও ঘটনাচক্রে অঘটন ঘটলো একদিন।

অন্যদিনের মতো সেদিনও ফলবার্গ ল্যাবরেটরি থেকে ফিরে বেশ ভালভাবে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসেছেন। কিন্তু খাবার মুখে দিতে গিয়েই বিকৃত হয়ে গেল তার মুখ— থু' 'থু' করে ফেলে দিলেন যেটুকু দিয়েছিলেন মুখে। ভুরু কুচকে তিনি ভাবতে লাগলেন,—ব্যাপার কি? খাবার এত মিষ্টি লাগছে কেন? একটি পদ বাদ দিয়ে অন্যটি মুখে দেন—কিন্তু সেটিও তেমনি মিষ্টি। ভাবলেন, তাঁর 'ল্যাণ্ডলেডি' তাঁর সাথে তাহলে কি প্রতারণা করেছেন? যে মিষ্টি তিনি পছন্দ করেন না—তাই ব্যবহার করা হয়েছে প্রত্যেকটি খাবারে? একবার ভাবলেন, ভদ্র মহিলা হয়তো ভুলে একাজটি করেছেন—অন্যমনস্ক হয়ে হয়তো লবনের বদলে চিনি দিয়েছেন। কিন্তু পর-মুহূর্তেই ভাবলেন—প্রত্যেকটি রান্নায় সেই একই ভুল? না এ অসহ্য।—এতো সাবধান করে দেয়া সত্ত্বেও এমনি ভুল, ইচ্ছাকৃত ছাড়া হতে পারে না। তাই ক্ষমা করা যায় না এমন ভুলকে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন ফলবার্গ। মুখে—'ড্যাম, ফুল, ইডিয়াট' ইত্যাদি গালাগাল উচ্চারণ করে চিৎকার করে, তিনি খাবার টেবিলের জিনিসপত্র সব ছুঁড়ে ফেলে, আছড়ে ভাঙ্গতে লাগলেন। ভাঙ্গার শব্দ এবং ফলবার্গের চিৎকার গৃহকর্ত্রী যখন ছুটে আসলেন সেখানে, তখন ফলবার্গ মারমুখী হয়ে তাঁর সব খাবারে এত মিষ্টি দেয়া হয়েছে কেন জানতে চাইলেন। গৃহ-কর্ত্রী'তো অভিযোগ শুনে একেবারে অবাক! কিন্তু বার বার হলফ করে তিনি যখন বললেন যে তাঁর কোনো খাবারেই কোনো মিষ্টি দ্রব্যের কণামাত্রও ব্যবহার করা হয়নি তখন অবাক হওয়ার পালা এলো ফলবার্গের। তবে কি তাঁর হাতেই রয়েছে এমন কিছু যা এই দারুণ মিষ্টির কারণ? মুখে আঙুল দিয়ে দেখলেন,—ঠিক তাই, কিন্তু কী আশ্চর্য— ল্যাবরেটরি থেকে আসার সময় তিনিতো ভালভাবেই হাত ধুয়েছিলেন। যা তিনি নিত্যই করে থাকেন—আবার বাসায় এসে আর একবার তেমনি ভালভাবেই—হাত ধুয়েছিলেন, খাবার মুখে দেয়ার আগে। তাছাড়া, খাবারে হাত দেয়ার আগেও তো তিনি স্পর্শ করেন নি কোনো মিষ্টি দ্রব্য? তা হলে?

ফলবার্গ আবার হাত ধুলেন—কিন্তু আশ্চর্য,—আঙুলের মিষ্টত্ব তাতে যেন আরো বেড়ে গেল। ব্যাপার কী? তবে কি তার আজকের কাজে এমন কোন অলৌকিক মিষ্টি দ্রব্যের আবির্ভাব ঘটেছে—যার মিষ্টত্ব মুছে যায় না। শতবার ধৌত করলেও?

এই কথা মনে হতেই তিনি গৃহকর্ত্রী'কে তেমনি বিমূঢ় অবস্থায় রেখে তৎক্ষণাৎ ছুটে গেলেন তাঁর ল্যাবরেটরিতে, আর পাগলের মতো সেদিনের সব তৈরি জিনিসগুলির স্বাদ গ্রহণ করতে লাগলেন আর এমনি এক কৌতুককর কাণ্ডের মধ্য দিয়েই আবিষ্কৃত হলো মধুর চেয়েও : 50 গুণ বেশি মিষ্টদ্রব্য স্যাকারিন।

ফলবার্গ যে বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন তার সাথে কোনো মিষ্ট দ্রব্যের সন্ধান বা আবিষ্কার করার মোটেই কোনো সম্পর্ক ছিল না—মাঝপথে অকস্মাৎ তিনি সন্ধান পান এই স্যাকারিনের—তাই এটি একটি আকস্মিক আবিষ্কার। আর বিজ্ঞানের ইতিহাসে এমনি আকস্মিক আবিষ্কারের নজির রয়েছে অনেক, ভুরি ভুরি। কিন্তু এমন কোনো নজির নেই—যেখানে বিজ্ঞানী এমন কিছু আবিষ্কার করেছেন যা তাঁর পছন্দ নয়। স্যাকারিন আবিষ্কারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে বিপরীত ব্যাপারটাই। মিষ্টির প্রতি একান্ত বিরূপ এক বিজ্ঞানীই কি না আবিষ্কার করলেন এমন এক মিষ্টদ্রব্য যার মিষ্টত্ব আমাদের নিত্য ব্যবহৃত মিষ্টি চিনির চেয়েও প্রায় 500 গুণ বেশি।

মানুষ মানুষকে নিয়েই কৌতুক করে থাকে কিন্তু, বিধাতাও মাঝে মধ্যে ফলবার্গের মতো মানুষকে নিয়ে এমনি কৌতুক করেন বৈকি!

370, আউটার সারকুলার রোড, রাজার বাগ, ঢাকা-17
বাংলাদেশ

ছাতা আবিষ্কারের কাহিনী নির্মলকান্তি ঘোষ

ছাতা কিন্তু আজ থেকে বেশীদিন আগে আবিষ্কার হয়নি। মাত্র তিনশো বছর পিছিয়ে গেলেই দেখা যাবে রোদ ঝড়-জল-বৃষ্টি সত্ত্বেও মানুষের মাথায় ছাতা নেই। লোকে ছাতা ছাড়াই চলেছে, অবশ্য যাদের তাড়া আছে। আর যাদের তেমন কোন ব্যস্ততা নেই, তারা ঝড় জল থামার জন্য অপেক্ষা করেছে। সাধারণ মানুষ তখন ছাতা ব্যবহার করতো না। ছাতা থাকতো রাজা-বাদশাদের শুধু।

ছাতা প্রথম কে আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম জানা যায় না। তবে সাধারণে যাতে ছাতা ব্যবহার করতে পারে, সে কথাটা সর্বপ্রথম যাঁর মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকে তিনি হলেন জোনাস হ্যানওয়ে। অতীতের ইতিহাস থেকে জানা যায় তাঁর প্রচেষ্টায় আজকের দুনিয়ার ছাতার ব্যাপক প্রচার।

প্রথমে ছাতার প্রচলন কিন্তু অনেকে মেনে নিতে পারেনি, বিশেষ করে ঘোড়ার গাড়ির কোচোয়ানরা। তারা তো ক্ষেপে লাল। অবশ্য এর যে একটা সঙ্গত কারণ ছিল না বলা যাবে না। তখনকার দিনে যানবাহন বলতে প্রধানত ঘোড়ার গাড়িকে বোঝাতো। রোদে-ঝড়-জল-বৃষ্টিতে লোকে ঘোড়ার গাড়িতে চড়তো। কিন্তু ছাতা ব্যবহারের ফলে অনেকেই ঘোড়াগাড়ি ভাড়া করতে চাইতো না। ফলে ঘোড়ার গাড়ির চাহিদা কমে যেতে লাগলো। কোথায় ঝড়-বৃষ্টিতে চাহিদা বাড়বে তা নয় ছাতা এসে তাদের অন্ন মারতে পর্যন্ত বসেছে।

শুধু কোচোয়ানরা নয়। ওদের সঙ্গে যোগ দিল চার্চের পুরোহিতরা। তাঁরা বলতে লাগলেন, ভগবান বৃষ্টি সৃষ্টি করেছেন ভেজবার জন্য। সুতরাং ছাতা মাথায় দেওয়া মানে ঈশ্বরকে অপমান করা। এটা আমরা কিছুতেই হতে দেবো না।

ওদিকে 1750 সালে হ্যানওয়ে তো ছাতা বগলে করে রাস্তায় বের হলেন। তখন কোচওয়ানরা তাঁর পিছনে লাগলো। এছাড়া রাস্তার বহু মানুষ তাঁকে টিটকারি তো দিতেই থাকে এবং ঢিলও ছোঁড়ে। কিন্তু তিনি দমবার পাত্র নন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। একদিন মানুষ এর উপকারিতা বুঝবেই।

হ্যানওয়ের ধারণাই একদিন বাস্তবে রূপ নিল। পঞ্চাশ বছর পরে ইংল্যাণ্ডে এক ধরনের ছাতা তৈরি হতে লাগলো। তখন ছাতার কাপড় ছিল চামড়ার এবং শিক তিমিমাছের হাড় দিয়ে তৈরি। প্রথম প্রথম এই ছাতাকে লোকে বলতো 'রবিনসনস্'। কারণ রবিনসন ক্রুশোর গল্পে ছাতাকে 'শাওয়ার স্টিক' বা 'বৃষ্টি-যষ্টি' বলা হতো। এরপর ছাতার ক্রমবিবর্তনের ফলে ছাতার শিকগুলো তৈরি হতে লাগলো লোহা দিয়ে এবং চামড়ার বদলে ভেড়ার লোম দেওয়া হতো।

এরপর ছাতার কদর ভীষণভাবে বেড়ে যেতে লাগলো। লোকের আভিজাত্য যাচাই হতো ছাতা দিয়ে। যার বাড়িতে যত দামী ছাতা থাকবে, সে তত বড়লোক বলে চিহ্নিত হতো। আর ছাতার বাঁটের নক্সা অনুযায়ী ছাতার দাম বাড়তো। এছাড়া, দামী ছাতায় মূল্যবান পাথর, মুক্তো ইত্যাদি বসানো থাকতো। 1900 সাল থেকে 1925 সাল পর্যন্ত সবচেয়ে দামী ছাতার মূল্য ছিল এক হাজার টাকা। আজকের দিনে একথা ভাবা যায়?

ইতিমধ্যে আমেরিকায় ছাতার প্রচলন হয়ে গেছে। আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম লিঙ্কন ছাতাকে দারুণভাবে ভালোবেসে ফেললেন। এমন কি তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন তখনো সঙ্গে তাঁর প্রিয় ছাতাটা নিতে ভুলতেন না।

এই সঙ্গে আরো কয়েকজনের নাম করা যায়। বিশ্ব বিখ্যাত সাহিত্যিক চার্লস ডিকেন্স তাঁর সাহিত্য রচনায় মিসেস গ্যাম্প নামে এক মহিলার সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তাঁর থেকে তাঁর ছাতার বিবরণ বিরাট। এ থেকেই সহজে বোঝা যায় যে, স্বয়ং সাহিত্যিক ছাতাকে কত কদর করতেন।

এবার একটা মজার কথা বলা যাক্। বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত সাহিত্যিক হলেন রবার্ট লুই স্টিভেনসন। তাঁর ছাতার উপর দারুণ সখ ছিল। তিনি ভালো ভালো ছাতা যোগাড় করে অতি সযত্নে তা জমিয়ে রাখতেন। শুধু তাই নয়। বৃষ্টির দিন রেলস্টেশনে বা বড় দোকানের পাশে একটা ছাতা দাঁড় করে নিজে লুকিয়ে থাকতেন। কেউ তা হাতাবার চেষ্টা করলেই, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে ধরে ফেলতেন।

এবার শেষ করার আগে ছাতার একটা বিশ্ব রেকর্ডের কথা বলছি। সেই ছাতা প্রচারের যুগে আর্নেস্ট অ্যাকারম্যান নামে আমেরিকার একজন মন্ত্রী চ্যালেঞ্জ করে ছাতা পঁচিশ ঘণ্টা তিনি কাছছাড়া করেননি। তিনি একটানা পঁচিশ ঘণ্টা ছাতা বয়ে বেড়িয়েছেন। এর জন্য রাতে তিনি ঘুমোননি পর্যন্ত। স্নান করে বা খাওয়ার সময় পর্যন্ত ছাতা হাতে করে রেখেছিলেন। অর্থাৎ ঐ সময় ছাতা সারাক্ষণই তার সঙ্গে ছিল। আজ পর্যন্ত এ রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেনি।

128/2 হাজরা রোড, কলকাতা-26

'আমরা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করি না'

রণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

বিজ্ঞানে বিশ্বাস করা মানে অনেকে দৃঢ় প্রত্যয় মনে করেন না। অনেক শিক্ষিত লোকের মধ্যেও বিজ্ঞান সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব দেখা যায়। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান যে ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তার সঙ্গে তাল রাখা সাধারণ লোক কেন শিক্ষিত লোকের পক্ষেও প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এমন সব বৈজ্ঞানিক তথ্য বা বিষয় মাঝে মাঝে বৈজ্ঞানিক জগৎ থেকে উপস্থাপিত করা হচ্ছে যা আমাদের মনে সংশয় মেশানো বিস্ময়ের উদ্রেক করছে —কিন্তু সত্যিকারের বিশ্বাস গড়ে উঠছে না। ইংরাজীতে এই ধরণের বিশ্বাসকে বলা হয় Conviction। যেমন জজ সাহেব মনে বিশ্বাস না হলে সাজা দেন না। খুনের বিচারে জজ সাহেব বাদীপক্ষকে জিজ্ঞাসা করেন কেহ খুন করতে দেখেছে কিনা। উত্তরে বাদীপক্ষ বলে যে খুন করতে কেহ দেখে নি। তবে বাদীপক্ষের দুজন সাক্ষী আছে। একজন দেখেছে যে খুনী নদীর ধারে যাচ্ছে। একজন জলের মধ্যে 'ঝপ করে পড়ার' শব্দ শুনেছে। পুলিশ অফিসারের কাছে খুনী স্বীকার করেছে যে সে খুন করে ঐ ব্যক্তিকে জলের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। এই সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে জেরা ও সওয়াল শুনে যদি জজসাহেবের মনে দৃঢ় বিশ্বাস বা প্রত্যয় (Conviction) হয় যে আসামী খুন করে তবেই আসামীর সাজা হবে। বস্তুতঃ সব ক্ষেত্রেই আসামীকে সাজ দেবার আগে জজ সাহেবের মনে দৃঢ় প্রত্যয় হওয়া দরকার যে আসামী দোষী না নির্দোষ।

বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে তুলতে গেলে বিজ্ঞান সম্বন্ধে এই ধরণের প্রত্যয় গড়ে তোলা দরকার। বৈজ্ঞানিক তথ্য বা প্রদর্শনী ছাড়াও বিজ্ঞানকে জীবনের ধারার সঙ্গে মিশিয়ে না দিলে সত্যিকারের বিশ্বাস জন্মে না। যার ফলে বিজ্ঞান মানসিকতা গড়ে ওঠে না।

অনেক সময়ই বৈজ্ঞানিক তথ্য শিক্ষিত মানুষের মনেও দাগ কাটে না। যেমন ধরা যাক বৈজ্ঞানিক তথ্য হিসাবে পাওয়া যায় প্রত্যেক সেণ্টিমিটার জায়গার মধ্যে 10 কোটি অণু থাকে। এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষিত মানুষের মনের মধ্যেও প্রশ্ন উঠে এই দশ কোটি অণু এক সেণ্টিমিটার জায়গার মধ্যে কি ভাবে আছে। যদি তারা পাশাপাশি থাকে তাহলে তাদের আকার কতটুকু। এদের-কেও খালি চোখে বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখেছে কিনা দেখে থাকলে অণুগুলি দেখতে কি রকম। এই সমস্ত বিষয়ে স্বভাবতঃ তার ধারণা অস্পষ্ট হয়ে উঠে। তাই সত্যিকারের বিশ্বাস গড়ে উঠতে বিলম্ব হয়। এই বিষয়ে আর একটি বৈজ্ঞানিক তথ্য আলোচনা করা যেতে পারে। মানুষের মগজ (brain) এক অতি শক্তিশালী যন্ত্র যা কিনা পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী 2 লক্ষ কমপিউটারের সমান। অথচ আমরা এই মগজের মাত্র দশ শতাংশ ব্যবহার করে। বাকী অংশ ব্যবহার করা হয় না। যে ওজন করছে তাকে যদি বলা হয়, যে তার বাটখারার মধ্যে অসংখ্য ছিদ্র আছে এবং আসলে ওটি নিরেট লোহা নয় ও ওর ভিতর শূন্যতায় ভরা আর যেখানে অসংখ্য বিদ্যুৎকণা অতি বেগে ছোটাছুটি করছে, লোকটি কেন অনেক শিক্ষিত লোকের মধ্যেও এ বিষয়ে সংশয় আসবে। সূর্যের মধ্যস্থলের উষ্ণতা 2 কোটি ডিগ্রী বললে সেই সম্বন্ধে ধারণা খুব একটা স্বচ্ছ হবে বলে মনে হয় না।

তাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে সত্যিকারের সচেতনতা গড়ে তুলতে গেলে বিভিন্ন রকম কর্ম্মসূচীর মাধ্যমে বিজ্ঞান সম্বন্ধে যুবমানসে প্রত্যয় জাগিয়ে তুলতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের যুবকল্যাণ বিভাগের তরফ থেকে বিজ্ঞানের আলোচনা চক্র বিজ্ঞান প্রদর্শনীর ব্যবস্থা, বিজ্ঞান বিষয়ে প্রবন্ধ ও প্রতিযোগিতার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়। এ ছাড়া বিজ্ঞান সম্বন্ধে সত্যিকারের বিশ্বাস গড়ে তোলার জন্য আরও ব্যাপক কর্ম্মসূচীর আয়োজন করা হচ্ছে— যা অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞানকে মানুষের জীবনধারার সঙ্গে মেশাতে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

উপসচিব, ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ বিভাগ, পঃ বঃ সরকার

বিজ্ঞান আন্দোলনে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে

সৌমিত্র লাহিড়ী

বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর অহংকার। আবার এই বিজ্ঞানই বর্তমানের আতংক। স্বভাবতই বিজ্ঞানের অগ্রগতি ও সাফল্য কোন নিরিখে গ্রহণ করা হবে তা নির্ভর করে তার প্রয়োগকর্তার ওপর।

বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং নব নব বিজয় অভিযান প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক জীবন উন্নতর করা এবং মানুষের শ্রমের লাঘব করার কাজে বিগত কয়েক দশকে অসামান্য অবদান রেখেছে। জ্ঞানে বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ মানব সভ্যতা দ্রুত তালে এগিয়ে চলেছে। এই চলার পথ সর্বত্র সব সময় মসৃণ ও সুখকর হয় নি। এই বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব আবিষ্কারই একদিন 6 আগস্ট, 1945-এর জন্ম দিয়েছিল, যেদিন বিশ্ববাসীকে হতচকিত করে সভ্য মানুষের দানবীয় দাবা সৃষ্টি করেছিল হিরোসিমার।

আজও কম্পিউটারের যুগে, আণবিক বিজ্ঞানের যুগে, আমরা দুঃস্বপ্নের রাতের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি। বিজ্ঞানের প্রয়োগ সাফল্যে আমরা নদীর ঘাড় ধরে আদায় করছি বিদ্যুৎ, খনির অতল গর্ভ থেকে তুলে আনছি কালো মানিক, পাহাড়ের শীর্ষদেশে আহরণ করে দেখছি পৃথিবীর অপরূপ শোভা। প্রকৃতি আমাদের কাছে ক্রমশ নতজানু হচ্ছে, চাঁদ হয়ত হবে আমাদের বাগান বাড়ি। কিন্তু তবু আতংক! দুঃস্বপ্নের রাত। বিজ্ঞানের মোড়ক দেওয়া ভাবনায় ভর করে গ্রাম-শহর-নগর-বন্দর যে আমরা বানাচ্ছি, সেসব কি আমাদের দখলে থাকবে? আমরা তিল তিল করে গড়ে তোলা মানব সভ্যতার সম্পদ ধরে রাখতে পারব তো? কোন উন্মাদ বিকৃত মানস হিংস্র রাষ্ট্র নায়কের এক মুহূর্তের ভ্রান্তির ফলে এই পৃথিবীর অস্তিত্ব লোপাট হয়ে যাবে না তো? বিশ্বযুদ্ধের ঘর পোড়া মানুষ এই আতঙ্ক নিয়ে গুটি গুটি পায়ে এক বিংশ শতাব্দীর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। মনে পড়ে কবি গুরুর সেই অবিস্মরণীয় পংক্তি 'ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা / বাম হাতে পূর্ণ কর পাত্র'।

আমাদের সামনে আছে দুটো সম্পূর্ণ বিপরীত ধাঁচের সমাজঃ সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজ। সমাজতান্ত্রিক সমাজ 'ডান হাতে পূর্ণ কর সুধার' মূল-সূত্র ধরে অগ্রসর হচ্ছে। তারা লাফিয়ে লাফিয়ে এগোচ্ছে। সামাজিক স্বার্থে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে জনগণকে বিজ্ঞান মনস্ক এবং যুক্তিবাদী করে গড়ে তুলছে তারা। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োগ যেখানে দৃষ্টান্ত। কাজের যাঁতাকলে আটকে গিয়ে ক্লান্ত রিক্ত হতোদ্যম মানুষ সেখানে বিরাগ, বিজ্ঞানের প্রয়োগ সাফল্যে সেই সমাজের মানুষ শ্রম দেন আনন্দে। কাজ, আমোদ প্রমোদ এবং বিশ্রাম – সভ্য মানুষের এই মৌলিক চাহিদা সেখানে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। বিজ্ঞান সেখানে সভ্যতার বাহন। কুসংস্কার অন্ধ বিশ্বাস, ধর্মীয় গোঁড়ামী, সাম্প্রদায়িকতা এবং সংকীর্ণতা সেখানে ক্রমশ প্রাচীন পুঁথি ঘেঁটে গবেষকের আবিষ্কারের বিষয় হয়ে উঠছে। সেখানে কারিগরী ও প্রযুক্তি বিপ্লব মানুষের হাত অকেজো করে দেয়নি, বেকারী দারিদ্র্য অনাহারের মুখে বেশির ভাগ মানুষকে ঠেলে নিয়ে যায় নি।

কিন্তু আর একটা সমাজ ব্যবস্থাও আছে। সেখানেও বিজ্ঞানের অভূতপূর্ব সাফল্য ও ব্যবহার লক্ষ্য করার মত। বিলিয়ান-মিলিয়ানের ঘোর প্যাঁচে না গিয়েও বলা যায় বিজ্ঞান চর্চার মূল স্রোত সেখানে মানব সভ্যতাকে ধ্বংসের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে। যুদ্ধের জন্য নানা মুখোশের অস্ত্র, পুঁজির নাফা লোটার জন্য প্রযুক্তি ও কারিগরী বিপ্লবের প্রয়োগ। মুষ্টিমেয় মানুষ বিজ্ঞানের আবিষ্কারে প্রভুত্ব করছে, অগণিত মানুষ যুদ্ধের আতঙ্ক, পরিবেশ দূষিত হওয়ার আতঙ্ক, বেকার জীবনের আতঙ্ক, অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবে যাওয়ার আতঙ্ক ইত্যাদি নানা জাতের আতঙ্ক নিয়ে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত অতিবাহিত করছেন। বিজ্ঞান আশীর্বাদ থেকে অভিশাপ দাতা প্রাচীন গোঁড়া ব্রাহ্মণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। পান থেকে চুন খসলে যে কাণ্ডটা ঘটবে তা কল্পনা করতেও ভয় হয়। আজকের বিখ্যাত শহর হয়ত কালকে ধ্বংসস্তূপে ভরা নালন্দা হয়ে যাবে।

এই ভয় আর আতঙ্ক নিয়ে আমরা এগোব? আমরা চাই বা না চাই এক বিংশ শতাব্দী আসবেই। আমরা এক বিংশ শতাব্দীর যাত্রী। কিন্তু যাত্রা কোন পথে?

বলতে লজ্জা হলেও, উপায় নেই, বলতেই হবে দেশের প্রায় 65 শতাংশ মানুষ শাল পাতার মত নিরক্ষর। প্রাকৃত জ্ঞান ছাড়া কোন জ্ঞানের আলোই সেই দুর্ভেদ্য প্রাচীর টপকে প্রবেশ করতে পারে না, বিজ্ঞান তো নয়ই। 1973 সালে বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন করতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী বলেছিলেন, নিরক্ষরতা নিয়ে এতো হৈ চৈ করেন কেন। নিরক্ষর মানুষ তো অনেক বুদ্ধি ধরে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে একথা ঠিক নিরক্ষর মানুষও অনেক বুদ্ধি ধরে। প্রশ্ন হল এই বুদ্ধির ব্যবহার কি হবে না?

আমরা সত্তর কোটি মানুষের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ কোটি নিরক্ষর মানুষের বুদ্ধির ব্যবহার যদি করতে পারতাম তাহলে দেশ কোথায় পৌঁছাত। এই 45 কোটি মানুষ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানই জানল না, এক বিংশ শতাব্দীতে পৌঁছাবে কেমন করে? তাহলে আমরা সবাই নয়, মুষ্টিমেয় আলোকপ্রাপ্ত মানুষই কেবল এক বিংশ শতাব্দীতে যাব? এই প্রশ্নের মীমাংসা অত্যন্ত জরুরী।

বিজ্ঞান আর যুক্তিবাদ প্রায় পরিপূরক শব্দ। বিজ্ঞান-মনস্ক মানুষ বলার অর্থই হলো যুক্তিবাদী মানুষ। যুক্তিবাদ পরাজিত হলে ভক্তিবাদ প্রাধান্য বিস্তার করে। মধ্যযুগে বিজ্ঞানের চর্চা তেমন ছিল না বলেই ভক্তিবাদের অবাধ মৃগয়া ক্ষেত্র বিরাজ করত। বর্তমান শতাব্দীতে বিজ্ঞানের প্রসার যত ঘটছে ভক্তিবাদ ততই অপসৃত হচ্ছে।

যুক্তিবাদের বিকাশ আশানুরূপ হয়নি বলেই আমাদের দেশে এখনও ভক্তিবাদের নানারূপ লজ্জাজনকভাবে মাথা তোলার চেষ্টা করে। জাত-পাতের প্রতি ভক্তি, সাম্প্রদায়িকতা-প্রাদেশিকতার প্রতি ভক্তি, গোষ্ঠী নেতার প্রতি ভক্তি, কুসংস্কার আর অন্ধ বিশ্বাসের প্রতি ভক্তি, মতান্ধতার প্রতি ভক্তি সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জীবনে প্রলম্বিত ছায়া ফেলে রয়েছে। এতে গণতন্ত্র, সামাজিক জীবন এবং ব্যক্তি জীবন সবই বিশণ্ণতায় ভুগছে। পশ্চাৎপদ ভাবনা চিন্তা সামাজিক রাষ্ট্রিক পরিবর্তনের আন্দোলনের তুরন্ত গতিও রোধ করছে। পেছন থেকে টানছে বলেই সামনে পা পড়লেও তার গতি হয়ে যাচ্ছে মন্থর।

আমি আপনি যদি চাইও, তাহলেও রাতারাতি খুব বড় পরিবর্তন ঘটে যাবে না। সুস্থ সবল সুন্দর শিশুর জন্য যেমন দশ মাস দশ দিনের গর্ভবাস মেনে নিতেই হয়, তেমনি পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষাকেও নির্দিষ্ট সময় মেনে চলতেই হবে।

তবে, এখন এই মুহূর্তে কর্তব্য কি? আমরা কি চুপচাপ বসে থাকব। আকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ না হলে কিছুই করা যাবে না এটা বলা আর সময়ের ডাকে সাড়া না দিয়ে পেছনে মুখ লুকিয়ে আত্মগোপন করা একই কথা। তাই আমাদের নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতেই হবে। এই কার্যক্রমের সর্বনিম্ন রূপ কি হবে? প্রথম ও প্রধান কাজ হবে বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ গড়ে তোলা। যারা নিরক্ষর, বিজ্ঞানের গবেষণাগার তো দূরের কথা সাধারণ বিজ্ঞানের জ্ঞানও পান নি, তাদেরও বিজ্ঞানমনস্ক করে তোলা যায়। অবশ্য দ্রুত নিরক্ষরকে সাক্ষর করে তোলা অন্যতম সামাজিক দায়িত্ব।

বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী মানুষ গড়ে তুলতে হলে দৈনন্দিন জীবন চর্চার অঙ্গ হিসাবে বিজ্ঞানকে দেখতে হবে।

একটু পরিষ্কার করে বলি। শিক্ষিত উচ্চ শিক্ষিত বিজ্ঞানের বড় বড় ডিগ্রির ডিপ্লোমাধারী মানুষের বাড়িতেও যদি যান, দেখবেন শতকরা পাঁচজন মানুষও ভুল করে বিজ্ঞানের পত্র পত্রিকা, বই পুস্তক বাড়িতে রাখেন না অর্থাৎ বিজ্ঞানের চর্চা করেন না। অর্থাৎ বছরের পর বছর বিজ্ঞান শিক্ষালাভের পরেও বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের মনে কোন আকর্ষণ জন্ম নেয় নি। অফিস-কাছারী কিংবা কলকারখানায় চাকরী বাকরী নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকতে থাকতে তারা ভুলেই গেছেন তারা বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। অতি অল্প কয়েকজন মানুষ বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন তাও অপচয় হয়ে গেল। বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে তারা কোন আদানই রাখলেন না। শিক্ষা সমাপ্তির সাথে সাথে বিজ্ঞানের সমাধি হয়ে গেল। সংকটের মুহূর্তে তাদের অনেকেই ছুটছেন তাবিজ কবচ, মাদুলি, জলপড়া, গুরুজী, পীর সাহেব, ভোলে বাবা ইত্যাদির রহস্যময় শক্তির কাছে মাথা বিকাতে। তাদের এই সর্বনাশ জাতীয় জীবনেও সর্বনাশ ডেকে আনছে।

সামাজিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রভাব যতটা পড়া উচিত ছিল এই সব কারণেই তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আমরা যখন সামাজিক বনসৃজনের কথা বলি, পোলট্রির মুরগীর কথা বলি, কিংবা বন্যার সময় জল ফুটিয়ে খাওয়ার কথা বলি, তখন প্রায়ই তা কথার কথা হয়ে থাকে। যতই অংক কষে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা হোক না কেন, মানুষ ওসব হিসাব সচরাচর গ্রহণ করেন না কেননা চেতনায় তা আঘাত হানে না। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী মনটাই যে তৈরি হয় নি। বিজ্ঞানের মূল কথা হল প্রশ্নে দীর্ণ হওয়া। কি, কেন, কেমন করে তা মিলিয়ে দেখা। চক্ষু ও কর্ণের মিলন না হলে বিজ্ঞান হয় না।

শিক্ষালয়ের চার দেওয়ালের বাইরে বিজ্ঞানচর্চার প্রসার ও বিকাশকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। একা সরকার এই কাজ করতে পারে না। সরকারী উদ্যোগের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগও প্রয়োজন। আমাদের রাজ্যে এই বেসরকারী উদ্যোগ একেবারে নেই তা নয়। নেই নেই করেও সারা রাজ্যে অন্তত চারশ ছোট বড় বিজ্ঞান ক্লাব ও সংগঠন আছে। আছে বেশ কয়েকটি উন্নত মানের পত্র পত্রিকা। প্রতি বছরই কম হলেও কিছু কিছু বিজ্ঞান নির্ভর গ্রন্থও প্রকাশিত হয়।

বিজ্ঞান ক্লাব, সমিতি ও সংগঠনগুলির সবার অবস্থা সমান নয়। কেউ নিয়মিত কেউ বা অনিয়মিত কর্মসূচি গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বিজ্ঞান শিবির, বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী মেলা এবং আলোচনা চক্র করেন। কেউবা আরও ছোট কর্মসূচি নেন। কারও কারও অবস্থা দাঁড়িয়েছে সাইনবোর্ড ছাড়া আর কিছুই নেই। পত্র পত্রিকা এবং প্রকাশিত গ্রন্থের অবস্থাও প্রায় একই রকম। তাই বিজ্ঞান ক্লাব, সমিতি ও সংগঠনগুলির সমন্বয় সাধন

কিশোর মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষা ও মডেল প্রদর্শনী

'কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ' এর জেলাভিত্তিক প্রথম অনুষ্ঠান গত 2রা অক্টোবর, 1986 তারিখে অনুষ্ঠিত হয় খড়্গপুর শহরের দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের বিবেকানন্দ হলে। এরপর পশ্চিমবাংলার প্রতিটি জেলায় এই পরিষদ একটি করে অনুষ্ঠান করবেন। খড়্গপুরের অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল এবং ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, খড়্গপুর। এই অনুষ্ঠানে মেদিনীপুর জেলার প্রায় শতাধিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করে 'কিশোর মেধা অনুসন্ধান পরীক্ষায়' এবং 'বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনীতে'। পরীক্ষায় এবং বিজ্ঞান মডেল প্রদর্শনী প্রতিযোগিতায় সফল প্রথম চারজন প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয় এবং এদের ছাড়াও আরও কিছু সংখ্যক প্রতিযোগীকে সার্টিফিকেট অব মেরিট প্রদান করে উৎসাহিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানে খড়্গপুর আই. আই. টি-র ছাত্ররাও বেশ কিছু উন্নতমানের মডেল প্রদর্শন করে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন খড়্গপুর আই. আই. টির ডিরেক্টর ডঃ জি. এস. সান্যাল। সভাপতিত্ব করেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, খড়্গপুরের অধ্যক্ষ শ্রীঅমিয় সিন্ধু সেন। প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন প্রখ্যাত বিজ্ঞান সাংবাদিক শ্রীসমরজিৎ কর। বিজ্ঞান বিষয়ক আলোচনা চক্রে অংশগ্রহণ করেন ডঃ জি এস. সান্যাল, ডঃ মধুজিৎ মুখোপাধ্যায় ডঃ তপনকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ভূ-বিজ্ঞানী শ্রীদিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীসমরজিৎ কর, শ্রীদিবাকর সেন ও শ্রীজয়ন্ত দত্ত প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন শ্রীগোবিন্দ দাস ঘোষ, ধন্যবাদ জানিয়ে ভাষণ দেন প্রখ্যাত শিশু সাহিত্যিক অমরনাথ রায়। কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরবীন বল পরিষদের জন্ম-কথা ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে ভাষণ দেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অমরনাথ রায়। তাঁকে সহায়তা করেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে বয়েজ হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, খড়্গপুরের কয়েকজন উৎসাহী শিক্ষক শ্রীগোবিন্দ দাস ঘোষ ডঃ মধুসূদন ভট্ট চার্য; শ্রীবিজয় চক্রবর্তী, শ্রী অমলেন্দু সরকার ও আরও অনেকে। প্রতিযোগিগণ ছাড়াও শতাধিক অধ্যাপক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সাংবাদিক, গবেষক ও বিজ্ঞানে উৎসাহী অভিভাবক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটিকে সাফল্যমণ্ডিত করেন।—নিজস্ব প্রতিনিধি

বাঁদিক থেকে : রবীন বল, সমরজিৎ কর, অমরনাথ রায়, অমিয়সিন্ধু সেন। উদ্বোধনী ভাষণ দিচ্ছেন আই. আই. টি. খড়্গপুরের ডাইরেক্টর জি. এস. সান্যাল। ছবি : পল্লব দাসগুপ্ত।

করে রাজ্য জুড়ে বিজ্ঞান আন্দোলন গড়ে তোলা অতি জরুরী কাজ। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ বিভাগ এই কাজে হাত দিয়েছে। বিভিন্ন বিজ্ঞান ক্লাব, সামাজিক সংগঠন, ছাত্র-যুব সংস্থা, নির্বাচিত প্রতিনিধি সংস্থাগুলিকে নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার আলাপ আলোচনা হয়েছে। প্রতি বছর ব্লকে ব্লকে বিজ্ঞান আলোচনা চক্র সংগঠিত করা হচ্ছে। জেলা স্তরে আলোচনা চক্র ও বিজ্ঞান মেলা হচ্ছে। রাজ্য স্তরেও অনুরূপ কর্মসূচি নেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন ছাত্র যুব সংগঠনের সম্মেলন ও বিশেষ অধিবেশনে বিজ্ঞান প্রদর্শনীরও আয়োজন হচ্ছে। প্রয়োজনের তুলনায় উদ্যোগ যতই সীমিত হোক না কেন অগ্রগতির একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এর সঙ্গে রাজ্য জুড়ে নিরক্ষতার অবসান ঘটানোর আন্দোলন পরিচালনার পরিকল্পিত উদ্যোগও রাজ্য সরকার গ্রহণ করছে। আশা করা যায় এই উদ্যোগ সাফল্যজনক ভাবে এগিয়ে যেতে পারবে।

আজকের ছাত্ররা এক বিংশ শতাব্দীতে পিতৃত্বের অধিকার নিয়ে সমাজকে পরিচালনা করার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তাই তাদের বিজ্ঞানমনস্ক যুক্তিবাদী করে তোলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই যুব ভারতী ক্রীড়াঙ্গনে 6 নভেম্বর থেকে 12 নভেম্বর পর্যন্ত সর্বভারতী বিজ্ঞান প্রদর্শনী মডেল প্রতিযোগিতা ও আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়েছে। এই কর্মসূচির সফল রূপায়ণ ঘটলে আগামি দিনে রাজ্যের বিজ্ঞান আন্দোলনের সমন্বয় সাধন ও অগ্রগতির পথ আরও মসৃণ হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

25/2 ফাল্গুণী আবাসন সল্টলেক সিটি, কলকাতা-91

দি ওয়ার অব দি ওয়ার্ল্ডস
বাণীরূপ-অনিল কর্মকার
চিত্ররূপ-গৌতম কর্মকার
নিরাপদেই মামাবাড়ীতে পৌঁছলাম, কিন্তু...
একি! তুমি ফিরে যাবে এখনি?
উপায় কী? গাড়ীটা তো ফেরত দিতে হবে মালিককে। চিন্তা কোর না, সাবধানে থেকো।
শুরু হোল যাত্রা...
ওহ, যদি ফিরে যেতে না হোতো! কী ভয়ংকর রাত! কে জানে, শহরের অবস্থা এখন কেমন।
আশ্চর্য, গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না! একটা মানুষও পথে দেখছি না।
আলো শুধু দুয়েক জায়গায় দেখা যাচ্ছে, বাকী সব অন্ধকারে ঢাকা। কে জানে, লোকজন ওখানে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, নাকি পালিয়েছে। আকাশে এতো আলো, যেন আগুন লেগেছে।
ঐ, গির্জার ঘড়িতে বারোটা বাজলো। দূরে ঝড় উঠেছে। প্রবল ঝড়। গাছগুলো মাতামাতি করছে। আরে, একি!
--ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-ঢং-
...সাঁ-আঁ-আঁ-ঝপ...
ওই-আবার--তৃতীয় মহাকাশযানটা এসে নামলো।
13

উঃ, বাজ পড়লো একটা। শিলা-বৃষ্টি হচ্ছে।
ঢালু রাস্তা -- পাগলের মতো ঘোড়াটা ছুটছে। কী করি? একবার বিদ্যুৎ, আবার ঘোর অন্ধকার। ঐ আবার বিদ্যুৎ চমকালো।
উঃ-কী সাংঘাতিক! ওটা কী? দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে।
আর একবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠলো।
একটা তিনপেয়ে দৈত্য। তিনতলা বাড়ীর সমান উঁচু। পাইন বনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছে। গাছগুলো মড় মড় করে ভেঙে পড়ছে। যেন বিশাল একটা ইঞ্জিন! ঝন ঝন শব্দ হচ্ছে ওটার গা থেকে। শিকলের শব্দ। দু'পাশে দুটো শিকল ঝুলছে।
সর্বনাশ! বিকট ঐ দৈত্যটা যে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে!
14

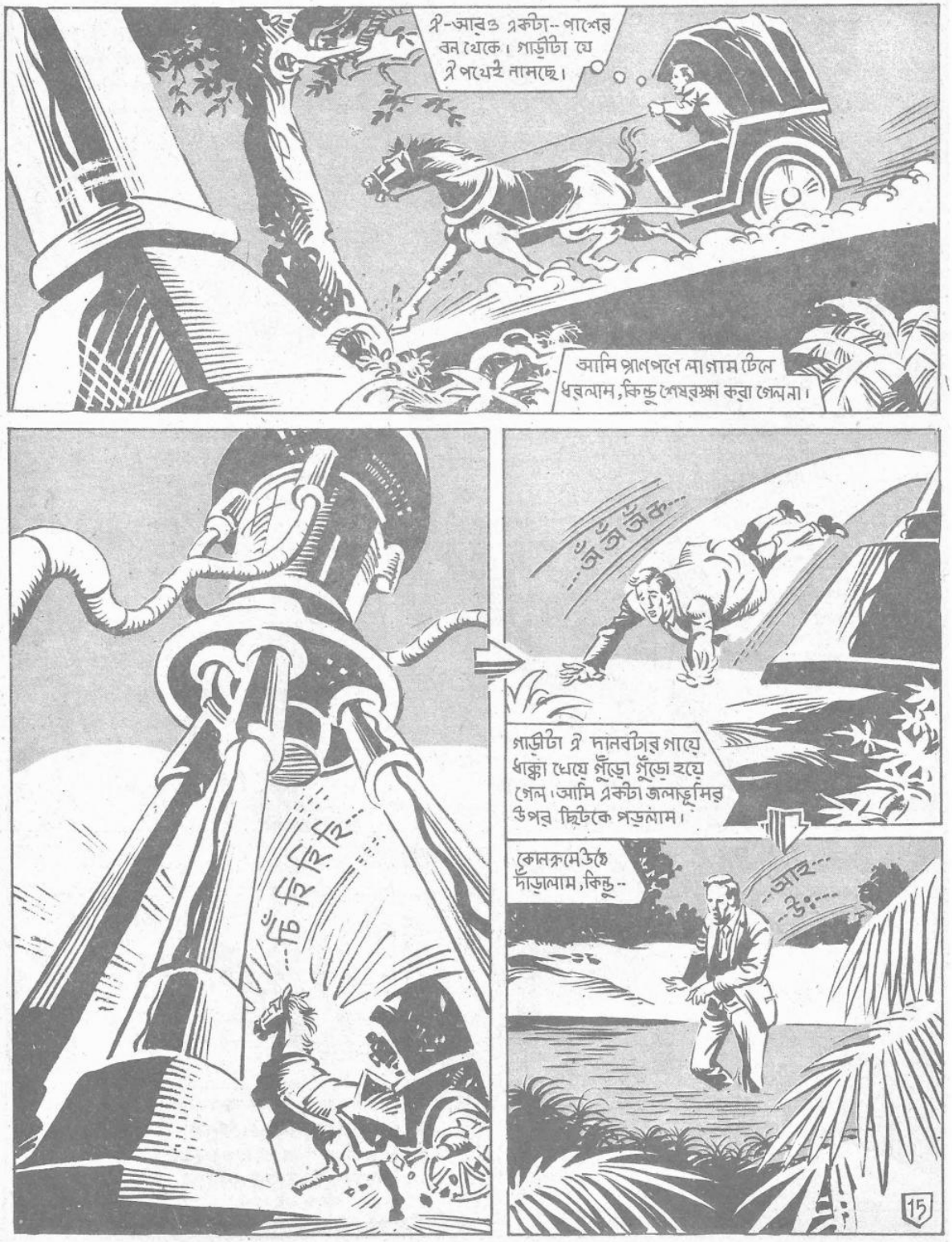

ঐ-আরও একটা--পাশের বন থেকে। গাড়ীটা যে ঐ পথেই নামছে।
আমি প্রাণপণে লাগাম টেনে ধরলাম, কিন্তু শেষরক্ষা করা গেলনা।
...চিঁ হি হি হি...
...ওঁওঁওঁক....
গাড়ীটা ঐ দানবটার গায়ে ধাক্কা খেয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেল। আমি একটা জলাভূমির উপর ছিটকে পড়লাম।
কোনক্রমে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু--
--আহ---
--উঃ---
15

হঠাৎ...
...আ-ল-লু-উ-উ-উ....
উঃ-যন্ত্রদানবটা টিলার উপর উঠতে উঠতে কাকে ডাকছে।
আশ্চর্য! যন্ত্রটা যেন জীবন্ত। হেলে দুলে যাচ্ছে, যেন বিচিত্র একটা প্রাণী। ওরই ভিতর কুৎসিৎ সেই জীবগুলো...
...আ-ল-লু-উ-উ-
ঐ-ঐ-আরো একটা... প্রথমটার পিছনে। দূরে সেই মহাকাশযানটার দিকে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে।
ওহ, সম্পূর্ণ অক্ষত! আমাদের কামান এদের কোন ক্ষতিই করতে পারেনি।
বৃষ্টির বেগ আবার বাড়ছে। তার উপর শিলার তাণ্ডব। বাড়ী ফিরতেই হবে। আগে তো প্রাণটা বাঁচাই। তারপর চিন্তা করা যাবে।
উঃ- আর পারছি না। শরীর বইছে না।
ছুটতে ছুটতে বাড়ী এসে কোনক্রমে পৌঁছলাম।
বিশ্রাম নেবার পর বাইরে তাকালাম।
কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য! কলেজের বাড়ী-সব বিধ্বস্ত। পাইন বন নিশ্চিহ্ন। দূরে টিলার উপর ঘোরাফেরা করছে মঙ্গলগ্রহের যন্ত্রমানুষ। আগুনের স্রোত খেলছে চারপাশে।
16

[24 পৃষ্ঠার পর]

'দেখতেই পাবেন', ওর চোখ কুঁচকে এল। 'আমার ধারণা ব্যাপারটা জানাজানি হোক চাইবেন না।'

ওরা এবার নৌকার দিকেই চলল।

'দাঁড়ান! আপনারা কে?' বললাম।

'আমরা মাল বাহক মাত্র:' লোকটা জবাব দিল। 'আমাদের টাকা দেওয়া হয়েছে। চললাম।'

'কিন্তু—এসব কি কিছুই বুঝলাম না।'

'বাক্সের মধ্যে একটা চিঠি আছে', সে বলল। 'ওতেই জানবেন আপনার বন্ধু এই পথে ফেরার ব্যবস্থা করেছেন কেন।'

'আমার বন্ধু?'

'কেলভিন। বাক্সটা দেখে নেবেন।'

সকলে নৌকোর দিকে এগিয়ে চলল।

'এক মিনিট'; বললাম। 'আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

'দক্ষিণে। বাক্সটা দেখুন—আর আমাদের চব্বিশ ঘণ্টা সময় চাই। কেলভিন কথা দিয়েছেন।'

আর কোন কথা না বলে পাঁচজনই নৌকোয় উঠে দ্রুত দাঁড় টেনে কুয়াশার মধ্যে হারিয়ে গেল। পায়ে পায়ে আমিও বাক্সটার দিকে এগোলাম।

বাক্সটায় চাবি ছিল না। আমি ঢাকনাটা তুললাম। বাক্সের মধ্যে শায়িত রয়েছে একটা ব্রোঞ্জের বিচিত্র ধাতব মানুষের মূর্তি। মূর্তিটা প্রায় সবুজ! আর সেটার উন্মুক্ত বুকে অদ্ভুত একটা লাল দাগ। সশব্দে এবার ঢাকনাটা বন্ধ করে দিলাম।

আগেই দেখেছি মূর্তির মাথার কাছে রয়েছে একটা ভাঙাচোরা অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র। আর তারই নিচে চাপা রয়েছে ভাঁজ করা কিছু কাগজ আর তাতে কেলভিনের পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা।

ঢাকনাটা আবার তোলার জন্য মনে সাহস আনতে চাইলাম। বেশ কিছুক্ষণ কাঁপা হাতে ঢাকনাটা স্পর্শ করার পরই সেটা খুললাম। যা দেখলাম তা বিশ্বাস করা আমার কাছে অসম্ভব ছিল। তারপর কোন রকমে কাগজ-গুলো নিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়তে শুরু করলাম। কেলভিনের লেখায় যা ছিল তা হল এই:

'প্রিয় রাসেল—

যেহেতু তুমিই আমার সত্যিকার বন্ধু তাই আমি আমার দেহ আর এই লেখা তোমার কাছেই পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছি। হয়তো এতে তোমার উপর অযথা ভার চাপিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু আমি নিজের উপর এই মুহূর্তে আর বিশ্বাস রাখতে পারছি না। মেক্সিকোতে কি পেয়েছি এখনও বুঝতে পারছি না। আমি এও বুঝতে পারছি না এইসব টুকরো ঘটনার কথা প্রকাশ করা উচিত কিনা। তাছাড়া আমি সেই নৃশংস মানুষগুলোকে আর সামলাতে পারছি না, আমি যা আবিষ্কার করতে পেরেছি ওরা তা কেড়ে নিতে চায়। যদিও আমার মৃত্যু তেমন সহজ হবে না, তবু মনে হয় যে শান্তি আমি রেখে যাব তার চেয়ে মৃত্যুতেই বেশি শান্তি পাব।

'তুমি হয়তো জান গত গ্রীষ্মে আমার যাওয়ার কথা ছিল রিও দ্য লে স্যাঙরে। এটা এক ছোট্ট নদী, প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। গত বছর এই নদীর লালচে জলে তীব্র তেজস্ক্রিয়তা আবিষ্কার করি, আমি আশা করেছিলাম আরও এগোলে কোন ইউরেনিয়ামের উৎস আবিষ্কার করব।

'গত শীতে আমি একটা পুরনো এরোপ্লেন কিনেছিলাম। ওটায় চড়েই ওই ঊষর দেশটা ঘুরেছি। গ্রীষ্মকাল এলে চলে যাই ভাকা মোরেনায়।

'একদিন নদীর উপর দিয়ে উড়তে উড়তে নিচে পাহাড় বেয়ে আসা লালচে ধারার জল চোখে পড়ে আমার। তাই অনুসরণ করার পর পৌঁছলাম সুউচ্চ কিছু গিরিশৃঙ্গের উপর।

'নদীটা ওখানেই হারিয়ে গিয়েছিল পাহাড়ের কোথাও। কোথায় নামা যায় খুঁজতে গিয়ে কয়েকবার পাক খেলাম—শুধু চোখে পড়ল গ্রানাইট আর লাভায় ঢাকা দিগন্ত বিস্তৃত এলাকা। আরও একটু ওঠার পরেই গহ্বরটা দেখতে পেলাম।

'আচমকা এবার চোখে পড়ল অবিশ্বাস্য এক বিশাল সবুজ আগুন, হয়তো মাইল দশ লম্বাই হবে। দুপাশে গাঢ় আগ্নেয় পাথরের প্রাচীর। প্রথমে ভেবেছিলাম ওই সবুজ আগুন আসলে জল, তবে এর স্থির বুকে কোন ঢেউ ছিল না। আমি বুঝেছিলাম ওটা কোন ভারি গ্যাস।

'পাহাড়ের শৃঙ্গে তখনও বরফ ছিল। তাদের শ্বেত শুভ্র শিখরে নানা রঙের অপূর্ব খেলা। দুশ্চিন্তা থাকলেও আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে ছিলাম।'

'রাত নেমে আসছিল। জানতাম এবার ফেরা দরকার। তবু রয়ে গেলাম। কারণ গহ্বরের নিচে ওই গ্যাসের ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। সূর্য অস্ত যেতেই বিচিত্র সব জিনিস দেখতে পেলাম। একটা পাতলা সবুজ কুয়াশা চূড়োর উপর জমা হল—সেগুলো এবার গলে গড়িয়ে চলল। তারপরেই কিছু যেন হ্রদটাকেই নাড়া দিল। ওটার মাঝখানের অংশ বিরাট গম্বুজের মত ফুলে উঠে উপরে এগিয়ে এল।

'ওই গ্যাস আবার নেমে যেতে নিচে থেকে একটা লাল বৃত্তকে উঠতে দেখলাম। তার মাথা সমতল, ধাতব আর মধ্যে জেগে ছিল হলুদ আগুন। খাড়া হয়ে সেটা পাক খেয়ে চলল। ভয়াল হলেও ওটার যেন একটা উদ্দেশ্য রয়েছে বুঝলাম।

'পাক খেতে খেতে ওটা আমার কাছাকাছি এসে পৌঁছল। এবার দেখলাম প্রত্যেক বৃত্তের মধ্যে রয়েছে

কালো গোলাকার দাগ। কয়েক মুহূর্ত সেই গোলাকৃতি জিনিসটা আমার উপর ঝুলে রইল। হলুদ তারগুলো আরও উজ্জ্বল হয়ে যেন সোনালী গ্রহের মত সমস্ত কুয়াশা শিখরগুলো থেকে শুষে নিল। আচমকা এবার সবই নিচের সেই সবুজ স্তরে ঝরে পড়ল।

'ভীত না হয়ে ধাঁধায় পড়েই ভাবতে চাইলাম নিচের ওই গর্তের জিনিসটা সত্যিকারের না কৃত্রিম না চোখেরই ভুল। আমার মনে পড়ছে ভেবেছিলাম ওই বিশাল ইউরেনিয়ামের স্তরের জন্য অজ্ঞাত কোন প্রতিক্রিয়া ঘটে যেতে পারে। আমার এটাও মনে হল হয়তো আমার আগেই এখানে কেউ এসেছিল। আর হয়তো আমি যা দেখছি তা কোন বিশাল আণবিক জাহাজের ধ্বংসাবশেষ।

'এবার প্রচণ্ড ভয়ের সঙ্গে দেখতে পেলাম একটা হালকা নীলাভ আলো আমার প্লেনের ককপিট ঢেকে ফেলেছে। এক মুহূর্ত পরেই সেটা সম্পূর্ণ প্লেন আর আমার শরীরটাও ঢেকে ফেলল। আমি মোটরটায় চাপ দিলাম আর আরও উঠতে চেষ্টা করলাম।

'মোটরে শব্দ হলেও উঠতে পারলাম না। অদ্ভুত কোন মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেন ওই নীলাভ আলোর সঙ্গে জড়িত ছিল বলে মনে হল। আমার সমস্ত চিন্তাশক্তি অসাড় হয়ে এল ...। আমাকে কে যেন টেনে নিতে শুরু করল।

'আমি লাফ মারতে বাধ্য হলাম। কি ঘটছে বুঝে ওঠার আগেই সেই গ্যাসের হ্রদে গিয়ে পড়লাম। দম আটকে যাবে ভেবেছিলাম কিন্তু তা হল না। বেশি দূরে দেখা না গেলেও কোন গন্ধ বা অন্য কিছু টের পেলাম না। আমার নিচে অন্ধকার একটা কিছু। কোন রকমে ঝাঁপ খেয়ে লাল বালির বুকে নেমে দাঁড়ালাম। সবুজ ওই গ্যাসেরই মত বালিও কেমন আলো ছড়াচ্ছিল।

'বেশ কিছুক্ষণ ককপিটেই রইলাম। কিছুক্ষণ পরে সেই নীলাভ দ্যুতির শক্তি মিলিয়ে গেল। আমি প্লেন থেকে আমার খাবার পাত্র আর অটোমেটিক পিস্তল নিয়ে বেরিয়ে এলাম। দারুণ ভারি লাগছিল ওগুলো।

'সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারায় হামাগুড়ি দিয়ে বালির উপর দিয়ে এগোলাম। বুঝলাম বুদ্ধিমান কিছুই আমাকে টেনে নামিয়েছে। প্রচণ্ড ভয় হল এবার। প্লেনের পাশে শুয়ে হঠাৎ পাঁচটা নীলাভ আলোকে কুয়াশায় ভাসতে দেখলাম। তাদের চারপাশে কুয়াশার ভারি পর্দা। কোন আকৃতি ওদের ছিল না।

'শেষ পর্যন্ত আলোগুলো মিলিয়ে যেতে আমিও এগোলাম। আমার চোখের সামনে শুধু লালচে বালি আর গাঢ় সবুজ কুয়াশা। শব্দহীন বাতাস যেন চেপে বসতে চাইছিল। আমি একা—সম্পূর্ণ একা! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানি না। প্রচণ্ড ভয়ই আমায় গ্রাস করেছিল। ভয় হচ্ছিল ভুল পথে চলে যাব। হঠাৎই একটা আলো নীলচে উল্কার মত মাথার উপর জেগে উঠতেই ছুটতে চাইলাম। কয়েক পা যেতেই শক্ত ধাতব কিছু পায়ে লাগল আমার।

'একটু পরে আলোটা মিলিয়ে যেতেই নিচু হয়ে দেখতে চাইলাম কিসে পা লাগল। জিনিসটা একটা ধাতুতে তৈরি পাখি—ডানা ছড়ানো, নখ বাঁকানো, হাঁ করা একটা ঈগল। পাখিটার রঙ চকচকে সবুজ।

'প্রথম দেখেই মনে হল ছাঁচে ঢালাই করা কোন ঈগল পাখিরই মূর্তি। তারপরেই বুঝলাম পাখিটার প্রত্যেকটা পালকই আলাদা আর নমনীয়—যেন কোন জীবন্ত ঈগলকে ধাতুতে পরিণত করা হয়েছে। আমি জানতাম ইউরেনিয়াম বিচূর্ণ করার ফলে সেটা সীসায় পরিণত হয়। তাই অবাক হয়েছিলাম তীব্র তেজস্ক্রিয়তায় পাখিও ধাতুতে পরিণত হতে পারে কি না।

'এবার আমার দেহের জন্যই ভয় লাগল। চারদিকে ওই রকম আরও মূর্তির খোঁজ করতে চাইলাম। চারদিকে এরকম অসংখ্য নিদর্শনও দেখতে পেলাম। ছোট, বড়

নানারকম পাখি, অদ্ভুত ধরনের মত উড়ন্ত পোকা। এমনকি বহুদিন আগে লুপ্ত একটা টেরোসর।

'বালি খুঁড়ে দেখতে গিয়ে আমার নিজের হাত থেকে একটা সবুজ আভা দেখতে পেলাম। আমার আঙুলের নখ আর হাতের লোম এরই মধ্যে হালকা সবুজ ধাতুতে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। এই ভয়ানক আবিষ্কার আমার স্নায়ুর ক্ষমতা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিল। পাগলের মতই চিৎকার করে আমি ছুটতে শুরু করলাম। একটা কালো আতঙ্ক আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল।

'আমার উপরের সবুজ অংশে উজ্জ্বল আলো ফুটে উঠল। উপর থেকে যে বিশাল এলাকা দেখেছিলাম সেখানে এসে দাঁড়ালাম। সেটা যেন কালো এক ধাতব দোলনায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। আমি আবার ছুটতে শুরু করলাম। কোনদিকে তা জানি না। সময়েরও কোন মূল্য ছিল না। আমাকে যা থামাল তা হল অদ্ভুত কোন গাছপালা। ওগুলোর রঙ বেগুনী অনেকটা ঘাসের আকৃতি। গাছগুলোর ডগায় হালকা গোলাপী ফল।

'ঝোপের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছিল লালচে রঙের একটা নদী – ভাবলাম নিশ্চয়ই এল রিও দ্য লা সাওরে। অন্ততঃ এখানে ওই উড়ন্ত আলো থেকে বাঁচব। ওখানেই শুয়ে পড়ে ফোঁপাতে শুরু করলাম।

'বেশ কিছুক্ষণ নড়তে পারলাম না। আমার আঙুলের দিকে তাকিয়েই আবার চমকে গেলাম। আরও চওড়া হয়েছে সেগুলো। আমি ধাতুতে বদলে যেতে শুরু করেছিলাম।

'বাঁচার তাগিদে উন্মাদ হয়ে গেলাম আমি। যেভাবেই হোক সেই গহ্বরের মুখ আর প্লেনটা খুঁজে পেতেই হবে। কিন্তু দুর্বলতা আমায় চেপে ধরেছিল। যদিও সত্যিকার খিদে ছিল না, তবু ভাবলাম কিছু খেতে পেলে শক্তি পাব।

'এই গাছ থেকে এক থোকা ফল পাগলের মতই ছিঁড়ে খেতে আরম্ভ করলাম। কেমন যেন নোনতা স্বাদ দেখে থু করে ফেলেও দিলাম। কিন্তু ফলগুলো ছেঁড়ার সময় আমার আঙুলে রস লেগে গিয়েছিল। আঙুল মুছে ফেলেই আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। আমার নখ থেকে সেই ধাতব স্পর্শ অদৃশ্য হয়ে গেছে।

'এবার আশার আলোই দেখতে পেলাম। বুঝলাম গাছপালায় বিবর্তনের ফলেই এ শক্তি জন্মেছে। পেটপুরে ওই ফল খেয়ে পাত্র থেকে জলও খেয়ে নিলাম। এরপর ওই ফলের রস পরীক্ষা করে দেখেছি ওতে এমন কিছু ছিল যাতে এক্সরে আলোয় পোড়া ক্ষত নিরাময় হয়। এটাই আমায় নিঃসন্দেহে গামা রশ্মি বিকিরণের সাংঘাতিক পরিণতি থেকে বাঁচিয়েছে।

'ওখানেই সকাল পর্যন্ত পড়ে রইলাম। সকালের আলো নিশ্চয়ই ওই গ্যাসের মধ্য দিয়ে আসায় সেটা অনেক পাতলা হয়ে এসেছিল, লাল বালিতেও উজ্জ্বলতা কম। আমার নখ আর লোমও স্বাভাবিক।

'এবার নদীর গতিপথ ধরে চলতে শুরু করলাম। আচমকা দেখলাম নদীটা শেষ হয়ে গেছে। সামনেই বিশাল পিচরেস্তের চূড়ো। এটাই সেই গহ্বরের পশ্চিম প্রান্ত। আমি উত্তরমুখে চলতে শুরু করলাম।

'কতক্ষণ চলেছিলাম জানি না। প্রায় দুপুরের সময় ক্লান্ত, বিধ্বস্ত হয়ে এক জায়গায় পৌঁছলাম। সামনেই ছড়িয়ে ছিল অসংখ্য উপড়ে পড়া গাছ আর পাখির দেহ। দুপাশে আমার পাহাড়ের খাড়া দেওয়াল তার কোনটা আট ফিট উঁচুই হবে। লাল বালির বুকেই সেগুলো জেগে রয়েছে।

'আচমকা দেখলাম সেই ছুটন্ত আলো। দারুণ ভয় আমাকে আবার চেপে ধরল। বুঝলাম দিন শেষ হয়ে এলেই ওরা জাগে। রাতের কথা ভেবেই আতঙ্কে নীল হয়ে গেলাম।

'আন্দাজে বুঝলাম প্রায় পনেরো মাইল এসেছি। হঠাৎই সেই চলন্ত আলোর একটা রেখা আমার মাথার উপর এসে দাঁড়াল। আমার কেমন মনে হল আলোগুলো আমাকেই খুঁজছে! ভয়ে কাঠ হয়ে একটা বালির গর্তে ঢুকে পড়লাম।

'আলোটা নেমে এল—নেমে এল আরও কাছে। একটা স্ফটিকের মতই কিছু ওটা। বিহ্বল হয়ে ওটাকেই দেখে চললাম। কয়েক ডজন ফিট লম্বা বরফের জটিল এক স্ফটিকের মতই ওটা। অদ্ভুত নীলাভ দ্যুতি বেরোচ্ছিল বস্তুটা থেকে। কোন জন্তু, গাছ বা যন্ত্র নয়—একটা জীবন্ত আলো।

আলোটা সটান আমার দিকেই নেমে এল।

'ভয়ের প্রতিবর্তী' ক্রিয়াতেই পিস্তল বের করে ওটাকে পরপর গুলি করলাম তিনবার। মসৃণ দেহ ছুঁয়ে গুলি ঠিকড়ে চলে গেল কুয়াশার মধ্যে।

'আলোর মধ্য থেকে এবার সরু সুতোর মত আলোর রেখা বেরিয়ে এসে আমায় জড়িয়ে ধরল—আচমকা মনে হল আমার সমস্ত শক্তি হারিয়ে গেছে। রেখাগুলো আমাকে স্ফটিকের সামনে টেনে তুলল। আমার বুকে এর স্পর্শের দাগ দেখতে পাবে।

'ওই স্পর্শ আমাকে নিদারুণ যন্ত্রণায় বিহ্বল করে ফেলল। যেন প্রচণ্ড বিদ্যুৎ স্পর্শে দেহমন অবশ হয়ে গেল। অস্পষ্ট ভাবেই টের পাচ্ছিলেম আমায় উপরে টেনে তোলা হচ্ছে। মনে হল আরও স্ফটিক মূর্তি আমার কাছে এসে পৌঁছেছে। কিন্তু আমার মন অবশ।'

'কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানি না। একটা উজ্জ্বল কমলারঙ মেঘের মধ্যে যেন মুক্ত অবস্থায় ভাসছিলাম। প্রথমেই আনন্দ হল কিন্তু শরীর নাড়তে গিয়ে পারলাম

না। হাত পা ছুঁড়লেও কোন কঠিন পদার্থের স্পর্শ পেলাম না। আমার শরীরে তখনও পোশাক ছিল। সেই জলের পাত্রটাও ভাসছিল। পকেটে পিস্তলটাও ছিল, কিন্তু কোন ওজন ছিল না সেটার। বুঝলাম কটা দিন কেটে গেছে।

'কোন রকমে নড়তে যেতে শরীরের পাশে দারুণ ব্যথা অনুভব করতে লাগলাম। জোর করেই আমার শার্ট ছিঁড়ে ফেলতেই বুকের উপর সেই বিচিত্র দুকোণা দাগ দেখতে পেলাম। এই দাগটা দেখেই কোন ক্ষোভ যেন আর রইল না।

'এবার দেখলাম সেই কমলা মেঘ আমারই পাশে ভাসমান। আমাকে যে বন্দী করেছে সেই স্ফটিকও আমার সঙ্গে ভেসে চলেছে। বুঝতে পারলাম এই আশ্চর্য অচেনা রাজ্যে আমি একজন বন্দী।

'বেশ কিছু সময় ওজনবিহীন মহাকাশ যাত্রীর মতই ভেসে রইলাম। নিজেই আমি নিজের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছিলাম। তাকাতেই দেখলাম সেই স্ফটিকের আলো এখন ঘুমন্ত কারণ দিনের বেলা।

'আমি জানতাম রাতের অন্ধকার নামলেই ওরা আবার জেগে উঠবে আর তারপরেই ওরা ওদের বন্দী মানুষ গিনিপিগকে ব্যবচ্ছেদ করে দেখতে চাইবে।

'কিছুক্ষণ চিন্তার পর আবার লক্ষ্য করলাম সেই স্ফটিকের মধ্যে মৃদু আলোর চিহ্ন জেগে উঠছে। করতে হলে এখনই কিছু করা চাই। ওদের ঠকানোর একটা পথই আছে। আমি পিস্তলটা কোন রকমে তুলে নিজের মাথায় গুলি করতে যেতেই অন্য একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। আমি ওই কুয়াশার মধ্যে দুবার গুলি করলাম।

'এই কাজটাই আমাকে রক্ষা করল। বন্দুকটা রকেটের কাজ করল। প্রতিবার গুলির ধাক্কা আমাকে ঘুমন্ত স্ফটিক থেকে দূরে সরিয়ে দিল। আমি ওই মেঘ থেকে বেরিয়ে এলাম।

'কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ আবার আমায় চেপে ধরল। প্রথমে খুবই হালকা ভাবে। সেই উজ্জ্বল বালিতে নেমে আমার এরোপ্লেনকে অক্ষতই দেখতে পেলাম। প্লেনে উঠে মোটরে স্টার্ট দিলাম। একটু পরে মোটরটা জীবন পেতেই অনির্দিষ্ট পথেই পা বাড়ালাম—।'

এখানেই পাণ্ডুলিপিটা শেষ। বাকি কথা লেখা ছিল আর এক টুকরো ছেঁড়া কাগজে। এটা পেন্সিলে এলোমেলো ভাবেই লেখা।'

'...আমার সব আশার দিন [শেষ ?]...আমার এই দেহ আমি বিজ্ঞানকে দান করব। ক্যাপ্টেন গ্যাণ্ডার আমার কাহিনীর শেষ কথা শোনাবেন।....সেই ভয়াল [সত্য ?]—।'

এই সব।

আমি আমার চিকিৎসককে সব কথা জানালাম আর তাঁকে ওই পাণ্ডুলিপি পড়তেও দিলাম। প্রায় অবিশ্বাস ভরেই তিনি সব পড়ে ফেললেন, তারপর উপদেশ দিলেন কাহিনীটা কাউকে না জানিয়ে গোপন রাখতে।

আমার পক্ষে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হল না। কারণ নানা ধরনের বিচিত্র সব গুজবের জন্ম হচ্ছিল। কলেজেরও অনেকে আমার কাছে এসেছিল।

ক্যাপ্টেন গ্যাণ্ডার আমার কাছে অবশ্য আসেন নি, তাই রহস্যটা কি জানতেই আমরা টাইবার্নের তিনজন একটা প্লেন ভাড়া করে পশ্চিম মেক্সিকোয় যাই।

যে গ্রামে কেলভিন প্রথমে যান আমরা সেখানে গিয়েছিলাম। সেখানকার লোকেরা জানাল কেলভিন আগে সেখানে গেলেও গত তিন বছরে নাকি যাননি।

এরপর আমরা সেই আগুনে পাহাড়ের সন্ধানেই উড়ে গেলাম। বিরাট সেই পাহাড়ি এলাকাও আমরা দেখলাম। কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও কোন লালচে নদী বা সবুজ প্রান্তর চোখে পড়েনি। কোনো ভাবেই আমরা খুঁজে পাইনি কোন ধাতব ঈগল পাখি বা তেজস্ক্রিয় কোন কিছু। তাহলে ?

আমরা বাধ্য হয়েই আবার ফিরে আসি। এরপরেই ঘটে অন্য এক ঘটনা। বিজ্ঞান দপ্তর আর সরকারি দপ্তর থেকে এব্যাপারে তদন্ত করতে আসে। তারা শেষ পর্যন্ত কেলভিনের ধাতব শরীরটাও নিয়ে যায়। এরপর তারা আবার সে দেহ ফেরতও দেয়। কোন মন্তব্য তারা করেনি।

আজও আমার বিশ্বাস অধ্যাপক কেলভিনের কাহিনী সত্যি। এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

টাইবার্নের মিউজিয়ামে এখনও বসানো রয়েছে কেলভিনের দেহ। মাঝে মাঝে কেমন যেন সেদিকে তাকালেই মনে হয় কেলভিনের মুখে এক রহস্যময় হাসি ফুটে উঠেছে। সে হাসি আমাদের জ্ঞান কত যে অসাড় সেকথাই মনে করিয়ে দিতে চায়।

* জ্যাক উইলিয়ামসের 'দি মেটালম্যান' কাহিনীর ভাষান্তর।

159/1বি, বকুলবাগান রোড, কলি-25।

পদার্থের অবস্থান্তর, পরিবর্তন এবং রাসায়নিক সমীকরণ

বিবেক রায়

'পদার্থ' কথাটি তো তোমাদের সবারই অতি পরিচিত। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিচার করলে আমরা পদার্থ বলবো তাদেরই, যারা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, যারা কিছুটা স্থান অধিকার করে থাকে, যাদের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা আছে এবং যাদের নির্দিষ্ট কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য আছে।—এই যে পদার্থ, এদের সাহায্যেই কোন বস্তু গঠিত হয়। যেমন ধর, কাঠ হলো পদার্থ এবং কাঠের তৈরি টেবিল বা চেয়ার হলো বস্তু। পদার্থ প্রকৃতিতে তিন রকম অবস্থায় থাকতে সক্ষম। যেমন ধর, বরফ—যা হলো জলের কঠিন রূপ, জল হলো ঐ পদার্থেরই তরল অবস্থা এবং জলীয় বাষ্প ও স্টীম হলো—একই পদার্থের গ্যাসীয় রূপ। এখন প্রশ্ন হলো একই পদার্থ কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়—এই তিন রকম অবস্থায় থাকতে পারে কেমন ক'রে ?

কঠিন অবস্থায় যে কোনও পদার্থেরই একটি নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে। কিন্তু কেন? তার কারণ কঠিন অবস্থায় যে কোনও পদার্থের অণুগুলির মধ্যে 'আন্তরাণবিক ব্যবধান' খুব কম থাকে এবং অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণ খুব বেশি থাকে। সেই কারণে কঠিন পদার্থের মধ্যে তার অণুগুলি খুব ঘন সন্নিবিষ্ট অবস্থায় থাকে। আর সেই কারণেই কঠিন পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন—দুইই থাকে। তরল পদার্থের মধ্যে তার অণুগুলির পারস্পরিক ব্যবধান অপেক্ষাকৃত বেশি থাকে বলে আন্তরাণবিক আকর্ষণও কম থাকে। তার ফলে তরল পদার্থে দৃঢ়তার অভাব ঘটে এবং সেই কারণে দৃঢ়তার অভাবের জন্যে তরল পদার্থের নিজস্ব আয়তন থাকে বটে, তবে নির্দিষ্ট আকার থাকে না। গ্যাসীয় পদার্থের মধ্যে অণুগুলির মধ্যে পারস্পরিক ব্যবধান এতো বেশি থাকে যে প্রকৃতপক্ষে এদের মধ্যে কোন আকর্ষণই থাকে না বললেই চলে। সেই কারণে গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা দেখায়। গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলির গতি এতো বেশি থাকে যে তারা চারদিকে ইতস্ততঃ ছুটোছুটি করে বেড়ায়। গ্যাসীয় পদার্থকে তাই কোন খোলা পাত্রে রাখা যায় না। এমন পদার্থকে যে আবদ্ধ পদার্থেই রাখা যাক না কেন, সেই পদার্থেরই আকার ও আয়তন অধিকার করে থাকে। গ্যাসীয় পদার্থের অণুগুলি বাধাহীন অবস্থায় ঘুরে বেড়াতে পারে বলে গ্যাসীয় পদার্থের নির্দিষ্ট আকার ও আয়তন থাকে না।

আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পদার্থের দু'রকম পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করে থাকি। একটির নাম ভৌত পরিবর্তন এবং অপরটির নাম রাসায়নিক পরিবর্তন। একখণ্ড বরফকে সাধারণ বায়ুমণ্ডলে ফেলে রাখ। দেখবে যে, বরফখণ্ডটি বায়ু মণ্ডল থেকে তাপ গ্রহণ করে ধীরে ধীরে গলে জলে পরিণত হয়েছে। এইভাবে উৎপন্ন জলকে যদি ক্রমাগত শীতল করতে থাক, তবে এক নির্দিষ্ট উষ্ণতায় তরল জল বরফে পরিণত হবে। এটা নিঃসন্দেহে একটা ভৌত পরিবর্তন। কারণ এই পরিবর্তনে জলের অণুর গঠনগত পরিবর্তন হয় না। বরফ, জল ও তাপ প্রয়োগে জলের জলীয় বাষ্পে রূপান্তর—একই বস্তুর বিভিন্ন রূপে পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত। এটা একটা ভৌত পরিবর্তন (অস্থায়ী পরিবর্তন বলে)। জলীয় বাষ্প থেকে আবার আমরা জল ও বরফ পেতে পারি। মনে রেখো—ভৌত পরিবর্তনে পদার্থের অণুর গঠন ও উপাদান অপরিবর্তিত থাকে। এবারে একখণ্ড পাথুরে চুণকে (CaO) জলে ফেলে দাও। অমনি জলকে টগবগ করে ফুটতে দেখবে। পাথুরে চুণের খণ্ডটি প্রথমে ফুলে ফেঁপে উঠবে। পরে তা ভেঙ্গে গুঁড়োয় পরিণত হবে। ঐ সাদা গুঁড়োর নাম কলিচুন [$Ca(OH)_2$]। চুণ এবং কলিচুণ সম্পূর্ণ ভিন্ন যৌগ। এই পরিবর্তন স্থায়ী এবং পরিবর্তনটি ঘটার সময় তাপের উদ্ভব হয়। অতএব এটি রাসায়নিক পরিবর্তন। রাসায়নিক পরিবর্তনের সময় তাপীয় পরিবর্তন ঘটবেই। ভৌত ও রাসায়নিক পরিবর্তনের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। রসায়ন বিজ্ঞানে আরও দুরকম পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়। একটিকে বলা হয় তাপদায়ী পরিবর্তন এবং অপরটি তাপ শোষক পরিবর্তন। একটু আগে চুণের কলিকরণের যে দৃষ্টান্ত দিয়েছি সেটি তাপদায়ী পরিবর্তন। জলের সঙ্গে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়াও একটি তাপদায়ী পরিবর্তন। আবার এর উল্টোটিও ঘটে। কিছু কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন আছে, যাতে তাপের শোষণ ঘটে। এমন, পরিবর্তনকে তাপশোষক পরিবর্তন বলে। যেমন ধর,

কার্বন ও সালফারের রাসায়নিক মিলনে যখন কার্বন ডাই সালফাইড নামক যৌগ গঠিত হয়, তখন প্রচুর তাপ শোষিত হয়। আবার একটি পরীক্ষা নলে কিছুটা জল নিয়ে তাতে কিছুটা নিশাদল (অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড) দ্রবীভূত কর। বেশ বুঝতে পারবে যে উৎপন্ন দ্রবণটি ঠাণ্ডা হয়েছে। তাপ শোষণের ফলেই এমনটি ঘটেছে। অতএব এটিও তাপ শোষক বিক্রিয়ার একটি সুন্দর উদাহরণ।

রাসায়নিক সমীকরণ ঃ

রাসায়নিক চিহ্ন ও সংকেতের সাহায্যে কোন রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ করা যায় রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে। জিংক ও লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় জিংক সালফেট ও হাইড্রোজেন। এই বিক্রিয়াটিকে ভাষায় ব্যক্ত করতে হলে যে পরিমাণ সময় ও কাজের প্রয়োজন হয় তা সংক্ষেপে করার জন্যে রসায়নবিদেরা উপরোক্ত রাসায়নিক বিক্রিয়াটিকে সংক্ষেপে প্রকাশ করেন এইভাবে ঃ $Zn+H_2S_4=ZnSO_4+H_2$,। এই যে রাসায়নিক সমীকরণ, এর সাহায্যে বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থগুলির গুণগত ও পরিমাণগত পরিচয় আমরা জানতে পারি। উপরোক্ত রাসায়নিক সমীকরণটির সমতা চিহ্নের (.=) বাঁ দিকে লেখা সংকেতগুলি হলো বিকারক বা বিক্রিয়ক পদার্থ এবং সমতা চিহ্নের ডান দিকে লেখা সংকেতগুলি হলো বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থের। আর সমতা চিহ্নের দ্বারা বোঝানো হয় যে ঐ চিহ্নের উভয় দিকের বিভিন্ন মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান এবং উপাদান পদার্থগুলির মোট ওজন, উৎপন্ন পদার্থগুলির মোট ওজনের সমান। কোনও রাসায়নিক সমীকরণকে যদি সমতা বিধান করা না হয় তাহলে মাঝখানের সমতা চিহ্নের বদলে কেবল মাত্র একটি→চিহ্ন বসানো হয়। যেমন ধর, আয়রন ও লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় ফেরাস ক্লোরাইড ও হাইড্রোজেন। এই সমীকরণটিকে সুসমঞ্জস করা না হলে, এর রূপ হবে এই রকম $Fe+HCl\rightarrow FeCl_2+H_2$ আর এটিকে সুসমঞ্জস রূপ দিতে গেলে লিখতে হবে $Fe+2HCl=FeCl_2+H_2$। রসায়ন বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে পরীক্ষকেরা 'সুসমঞ্জস সমীকরণই' আশা করে থাকেন। সমতা বিধান ক'রে সুসমঞ্জস রাসায়নিক সমীকরণ লেখাই বাঞ্ছনীয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে রাসায়নিক সমীকরণ থেকে কি কি বিষয় জানা যায়। প্রথমতঃ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী পদার্থ বা পদার্থগুলির কটি অন্য বিক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে পরিবর্তিত হয়ে বিক্রিয়াজাত পদার্থের কটি অণু গঠন করে, তা জানা।

দ্বিতীয়তঃ, রাসায়নিক সমীকরণে কোন্ কোন্ পদার্থ অংশ গ্রহণ করে এবং বিক্রিয়া শেষে কোন্ কোন্ বিক্রিয়াজাত পদার্থ উৎপন্ন হয়, তা জানা যায়। তৃতীয়তঃ, ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণকারী কোন্ কোন্ পদার্থ কি ওজনের অনুপাতে বিক্রিয়া করে এবং বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলির মধ্যে কোন্‌টি কি পরিমাণে পরিবর্তিত হয়ে কি পরিমাণ নতুন পদার্থ উৎপন্ন করে তা জানা যায়। চতুর্থতঃ, রাসায়নিক সমীকরণের বিক্রিয়ক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলি যদি গ্যাসীয় হয়, তাহলে একই চাপ ও উষ্ণতায় এদের আয়তনের অনুপাত জানা যায়।

রাসায়নিক সমীকরণ থেকে অনেক কিছু তথ্য জানা গেলেও, অনেক কিছুই আবার জানা যায় না। প্রথমতঃ জানা যায় না বিস্ফোরক ও বিক্রিয়াজাত পদার্থগুলির ভৌত অবস্থা অর্থাৎ (কঠিন, তরল বা গ্যাসীয়)। বিক্রিয়াটি তাপমোচী বা তাপগ্রাহী তা জানা যায় না। তৃতীয়তঃ, বিক্রিয়াটি ঘটাতে উষ্ণতা, চাপ বা অনুঘটকের প্রয়োজন হয় কিনা তা জানা যায় না। তৃতীয়তঃ, বিক্রিয়াটি উভমুখী কি না, তা জানা যায় না। চতুর্থতঃ বিক্রিয়াটি দ্রুতগতি বা মন্দগতি, তা জানা যায় না। চতুর্থতঃ সমীকরণে ব্যবহৃত পদার্থ গুলির ঘনত্ব সম্বন্ধেও কিছু জানা যায় না। পঞ্চমতঃ বিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হ'তে কতো সময় লাগে তাও জানা যায় না। রাসায়নিক বিক্রিয়া অনেক রকমের আছে, তার মধ্যে কয়েক রকম রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন ধর, 'সাক্ষাৎ সংযোগ বিক্রিয়া।' এক্ষেত্রে কোন যৌগ তার উপাদানগুলির প্রত্যক্ষ সংযোগে গঠিত হয়। উদাহরণ $C+O_2=CO_2$ আবার ঠিক এর উল্টোটিও ঘটে। বিয়োজন বিক্রিয়া কোন যৌগ একাধিক মৌলিক বা যৌগিক পদার্থে বিয়োজিত হয়। যথা, $CaCO_3=CaO+CO_2$ তাপ প্রয়োগে এই বিক্রিয়াটি ঘটে। বিপরিবর্ত বিক্রিয়ায়; দুটি যৌগিক পদার্থ পরস্পরের উপাদানের স্থান বিনিময় দ্বারা নতুন নতুন পদার্থ গঠন করে। যথা, $AgNO_3+NaCl=NaNO_3+AgCl$ থাকার প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় কোন যৌগের মধ্যেকার কোন একটি মৌল অপর কোন মৌল দ্বারা বিচ্যুত হয় এবং অপর মৌলটি ঐ মৌলের স্থান অধিকার করে।

ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

পদার্থবিজ্ঞানের কথা

অজয় চক্রবর্তী

এ কথা বলা হয়েছে যে, কোন বস্তুর ভর তার জাড্যের পরিমাপ নির্দেশ করে এবং তা নির্ধারিত হয় বস্তুতে বিদ্যমান পদার্থের পরিমাণ দিয়ে। কাজেই কোন বস্তুর ভরকে তার অপরিবর্তনীয় ধর্ম বলে মনে করা যায়। অবশ্য বিজ্ঞানী আইনস্টাইন তাঁর 'আপেক্ষিকতাবাদ'-এ দেখিয়েছেন যে, কোন বস্তু বেগবান হলে তার ভর বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষার সাহায্যেও তাঁর এ মতবাদ সমর্থিত হয়েছে। তবে, পার্থিব বস্তুর বেগ সাধারণত যে-মানের হয় সে-মানের বেগের ক্ষেত্রে ভরের পরিবর্তন তেমন তাৎপর্যপূর্ণ হয় না। কাজেই, পদার্থবিজ্ঞানের প্রাথমিক আলোচনায় কোন বস্তুর ভরকে অপরিবর্তনীয় বলে ধরা যায়। কোন বস্তুর ভর অপরিবর্তনীয় হলেও ওজন অপরিবর্তনীয় নয়। কোন বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে গেলে বস্তুর ওজনের তারতম্য ঘটে, যদিও তার ভর অপরিবর্তনীয় থাকে। ওজনের এ পরিবর্তনের কারণ হলো এই যে, অভিকর্ষজ ত্বরণ g-এর কার্যকরী মান বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন হয়।

প্রধানত তিনটে কারণে স্থানভেদে বস্তুর ওজন বিভিন্ন হয়। এর মধ্যে একটি কারণ হলো, পৃথিবীর আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। পৃথিবী পুরোপুরি গোল নয়, এটি উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা। পৃথিবীর মেরু-ব্যাসার্ধ এর নিরক্ষীয় ব্যাসার্ধের চেয়ে ছোট বলে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে মেরু অঞ্চলে অবস্থিত বস্তুর দূরত্ব নিরক্ষীয় অঞ্চলে অবস্থিত বস্তুর দূরত্বের চেয়ে কম হয়। ফলে, মেরু অঞ্চলে অবস্থিত বস্তুর ওপর অভিকর্ষ বল তীব্রতর হয়।

পৃথিবীর নিকটবর্তী বিভিন্ন স্থানে (ভূপৃষ্ঠের ওপরে কিংবা নিচে) কোন বস্তুর ওজনের পরিবর্তনের দ্বিতীয় কারণ হলো ভূ-কেন্দ্র থেকে আলোচ্য বস্তুর দূরত্বের হ্রাস-বৃদ্ধি। ভূপৃষ্ঠ থেকে ওপরে উঠলে ওজন কমে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, কোন বস্তুকে ভূপৃষ্ঠের সুড়ঙ্গপথে ভূকেন্দ্রের দিকে নিয়ে যেতে থাকলে বুঝি বস্তুটির ওজন বাড়তে থাকবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয় না। দেখা যায়, কোন বস্তুকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরে তুললেও যেমন বস্তুটির ওজন কমে, মাটির নিচে (যেমন খনিগর্ভে) নিয়ে গেলেও তেমনি বস্তুর ওজন কমে। এর কারণ হলো এই যে, কোন বস্তুকে ভূ কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে ($r<R$) নিয়ে গেলে বস্তুটির ওজন কার্যকরী আকর্ষণ বল প্রয়োগ করে কেবলমাত্র r ব্যাসার্ধের গোলকটি। কেন্দ্র থেকে r দূরত্বের বাইরে পৃথিবীর যে অংশ থাকে বস্তুটির ওপর সে-অংশের আকর্ষণ বলের মান শূন্য হয়। ফলে পৃথিবীর ভরের কার্যকরী মান কমে যায়। এক্ষেত্রে পৃথিবীর কার্যকরী ভর হবে

$$M' = \frac{4}{3}\pi r^3 d \qquad (\, d = \text{পৃথিবীর উপাদানের ঘনত্ব}\,)$$

কাজেই, ভূগর্ভে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে r দূরত্বে কোন বস্তুর ওপর পৃথিবীর আকর্ষণ

$$W' = \frac{GM'm}{r^2}$$

$$= \frac{G.\frac{4}{3}\pi r^3 d.m}{r^2} = \frac{4}{3}G\pi dm.r$$

দেখা যাচ্ছে যে, ভূগর্ভে বস্তুর ওজন ভূকেন্দ্র থেকে বস্তুর দূরত্ব r-এর সঙ্গে সমানুপাতে পরিবর্তিত হচ্ছে। ভূকেন্দ্রে r-এর মান শূন্য বলে ঐ স্থানে বস্তুর ওজন হবে শূন্য। অর্থাৎ, কোন বস্তুকে ভূ-কেন্দ্রে নিয়ে গেলে বস্তুটি ভারশূন্য অবস্থা লাভ করবে।

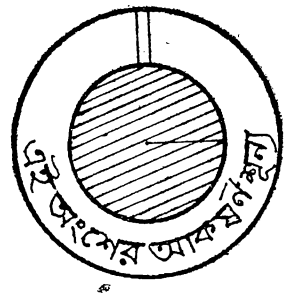

পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থানভেদে বস্তুর ওজনের পরিবর্তন ঘটার তৃতীয় কারণ হলো পৃথিবীর আহ্নিক গতি। পৃথিবী চব্বিশ ঘণ্টায় নিজ অক্ষের ওপর একবার ঘোরে। এ ঘূর্ণনের দরুন বস্তুর ওপর যে অপকেন্দ্র বল ক্রিয়া করে তার উল্লম্ব উপাংশ বস্তুর ওজন কিছুটা কমিয়ে দেয়। পৃথিবীর আহ্নিক গতির ফলে বস্তুর ওজনের হ্রাস সর্বোচ্চ হয় নিরক্ষীয় অঞ্চলে, কেননা এ অঞ্চলে অবস্থিত বস্তুগুলি যে বৃত্তপথে ঘোরে তার ব্যাসার্ধই সবচেয়ে বেশি। আহ্নিক গতির ফলে মেরু অঞ্চলে অবস্থিত বস্তুর ওজন প্রভাবিত হয় না, কেননা এ অঞ্চলে বিদ্যমান বস্তুগুলো কার্যত পৃথিবীর ঘূর্ণনের অক্ষের ওপর অবস্থিত বলে এরা যে বৃত্তপথে ঘোরে তার ব্যাসার্ধ কার্যত শূন্য।

ওপরের আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, একই বস্তুকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গেলে ওজনের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। মেরু অঞ্চল থেকে নিরক্ষীয় অঞ্চলে নিয়ে গেলে বস্তুর ওজন কমে, আর নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে মেরু অঞ্চলে নিয়ে গেলে বস্তুর ওজন বাড়ে। সমুদ্রের লেভেল থেকে কোন বস্তুকে পাহাড়ে কিংবা খনিগর্ভে নিয়ে গেলে বস্তুর ওজন কমে।

স্থানভেদে পৃথিবীর টানের এ পার্থক্য কাজে লাগিয়ে চতুর ব্যবসায়ীরা লাভবান হতে পারেন। বস্তু যেখানে হাল্কা সেখানে খরিদ করে বস্তু যেখানে ভারি সেখানে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করুন। তবে, এ প্রসঙ্গে উৎসাহী ব্যক্তিদের বলে দেওয়া দরকার যে, এ কেনাবেচায় তারা যেন সাধারণ তুলাযন্ত্র ব্যবহার না করেন। ওজনের তারতম্য কাজে লাগিয়ে লাভের কড়ি ঘরে তুলতে হলে তাদের কেনাবেচা করতে হবে স্প্রিং-তুলার সাহায্যে ; কেননা সাধারণ তুলাযন্ত্রে ওজন বা ওজনের তারতম্য মাপা যায় না। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হলেও ঠিক যে, সাধারণ তুলাযন্ত্রে আমরা ওজন মাপি না। সাধারণ তুলাযন্ত্রে আমরা কতকগুলো বাটখারার ভরের সঙ্গে বিভিন্ন বস্তুর ভরের তুলনা করি মাত্র। অর্থাৎ, সাধারণ তুলাযন্ত্র বস্তুর ভরের পরিমাপ দেয় সত্য, কিন্তু এর সাহায্যে ওজন বা ওজনের তারতম্য নির্ণয় করা যায় না। এর কারণ হলো এই যে, অভিকর্ষজ ত্বরণের পরিবর্তনের ফলে বস্তুর ওজন যে-অনুপাতে বদলায় বাট-খারার ওজনও সে-অনুপাতে বদলায়। কাজেই, সাধারণ তুলাযন্ত্রে ওজনের হেরফের ধরা পড়ে না। স্প্রিং-তুলায় ওজনের তারতম্য ধরা পড়ে, কেননা এর স্প্রিং-এর প্রসারণ নির্ভর করে ঐ তুলা থেকে ঝুলানো বস্তুর ওজনের ওপর।

দৈনন্দিন কথাবার্তায় আমরা 'ভর' এবং 'ওজন' শব্দ দুটোকে অভিন্ন অর্থে ব্যবহার করি। পদার্থ বিজ্ঞানের বিচারে এ দুটো শব্দ দুটো ভিন্ন ভিন্ন রাশির একক। এ প্রসঙ্গে ওজন এবং ভরের পার্থক্যটা ভালভাবে বুঝে নেওয়া যাক।

(i) কোন বস্তুর 'ভর' ঐ বস্তুতে বিদ্যমান জড়-পদার্থের পরিমাণ নির্দেশ করে এবং বস্তুটির জাড্যের পরিমাণ নির্দেশ করে। ভরের কোন দিক নেই। কাজেই এটি একটি স্কেলার বা নির্দিক রাশি। কিন্তু, ওজন একটি বল (force) নির্দেশ করে। পৃথিবী কোন বস্তুকে যে-বলে আকর্ষণ করে তাকেই বস্তুটির 'ওজন' বলা হয়। অভিকর্ষ বলের একটি নির্দিষ্ট অভিমুখ আছে বলে 'ওজন' একটি ভেক্টর রাশি। (ii) আন্তর্জাতিক একক পদ্ধতিতে ভরের একক হলো 'কিলোগ্রাম' এবং ওজনের একক হলো 'নিউটন'। (iii) কোন বস্তুর 'ভর' তার অবস্থান-নিরপেক্ষ, কিন্তু 'ওজন' বস্তুটির অবস্থানের উপর নির্ভরশীল। (iv) একটি নির্দিষ্ট স্থানে ওজনকে ভরের সমানুপাতিক ধরা যায়, কেননা সেক্ষেত্রে অভিকর্ষজ ত্বরণ g-এর মান নির্দিষ্ট। (v) সাধারণ তুলাযন্ত্রে ভর মাপা যায়, কিন্তু ওজন মাপা যায় না। ওজন মাপতে হলে স্প্রিং-তুলা ব্যবহার করতে হবে।

অঙ্ক যখন ধাঁধা অনাবিল সিদ্ধান্ত

কিছুদিন আগে ট্রাফিকজ্যামে আটকে পড়ে কিশোর ঘনাদা ক্লাবের মিটিংএ যখন পেঁাছোলাম তখন সবাই মিটিং শেষ করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ঐ দলে ছিল এক তরুণ—হাতে এক নোটবই। আমায় হন্তদন্ত হয়ে আসতে দেখে তরুণটি বলে উঠলো, 'এখন এসেছেন? দোহাই আপনার, কারো সঙ্গে করমর্দন করবেন না। আমার হিসেব গুলিয়ে যাবে।'

আমি হকচকিয়ে গেলাম। কী বলতে চাইছে তরুণটি? আমি বললাম, 'আমি মনেপ্রাণে বাঙালী। কারো সঙ্গে দেখা হলে আমি নমস্কার জানাই, করমর্দন করি না।'

উত্তরে তরুণটি বললো, 'ঘনাদা আন্তর্জাতিক মানুষ। আপনি করমর্দন করেন না শুনলে ঘনাদা আপনার কর্ণ মর্দন করে দিতেন।'

বড্ডো ডেপো ছেলে তো! মনে মনে বিরক্ত হলাম! তারপরই মনে হলো, ছেলেটা কি ক্ষ্যাপা নাকি? না হলে 'করমর্দন করবেন না' বলে চেঁচিয়েই বা উঠবে কেন, আবার করমর্দন করার অভ্যেস আমার নেই শুনেই বা রেগে উঠবে কেন?

কৌতূহল হলো। জানতে চাইলাম, 'কিন্তু, তুমি তো আমায় করমর্দন করতে বারণ করলে।'

—'সে তো অন্য কারণে।'

—'কী কারণ?'

—'সম্পাদক আমায় বলেছিলেন মিটিং-এ ক'জন উপস্থিত হন তার হিসেব রাখার। মাথা গুণে উপস্থিতির হিসেব রাখাটা ঘনাদা ক্লাবের পক্ষে অত্যন্ত জলো ব্যাপার হবে। তাই ভাবলাম, কোন অভিনব পদ্ধতিতে এ হিসেব রাখবো। ক্লাব-সদস্যরা সবাই সবার সঙ্গে করমর্দন করছেন দেখতে পেয়ে ঠিক করলাম, মাথা গুণে হিসেব রাখবো না, করমর্দনের সংখ্যা গুণেই উপস্থিত সদস্য-সংখ্যার হিসেব রাখবো। করমর্দনের মোট সংখ্যা থেকে উপস্থিত সদস্য-সংখ্যা কেমন করে বের করবো তা নিয়ে ভাবছিলাম। এমন সময় আপনি এলেন। আপনি কর-মর্দন শুরু করলে আবার নতুন করে হিসেব শুরু করতে হবে বলেই আপনাকে করমর্দন করতে বারণ করেছিলাম।'

আমি জানতে চাইলাম, তা, হিসেব করে কী পেলে? ক'জন সদস্য উপস্থিত হয়েছিলেন মিটিং-এ?'

তরুণটি নোটবুকে চোখ রেখে কেবল বললো, 'কর-মর্দন হয়েছিল আটাত্তরটি।'

এ সংখ্যা থেকে তোমরা মিটিং-এ উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাটা বলতে পারবে?

চেনা-অচেনা পাখি

জংলি নাকরি

অজয় হোম

একটি পাখি 1900 সালের পর থেকে ভারতে আর দেখাই যায় নি। সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্তি হয়েছে। বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির কয়েকজন 1981 সাল থেকে পাখিটিকে যেসব জায়গায় পাওয়া যেত সেইসব সম্ভাব্য জায়গায় অতিপাঁতি করে খুঁজে গত 14 জানুয়ারি 1986 তারিখে পুনঃ আবিষ্কার করেন। অন্ধ্রপ্রদেশে কুড্ডাপ্পা বলে এক জায়গায় এক আদিবাসী ফাঁদ পেতে ধরে বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির যেসব সভ্যরা ওই পাখিটিকে খুঁজছিলেন তাঁদের কাছে আনেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত নমুনাটি ধরা পড়ার পর বেশিক্ষণ বাঁচে না। সোসাইটির উৎসাহী সভ্যরা ঐসব জায়গায় আরও নমুনা ও সঠিক তথ্য জানার জন্যে খুঁজে চলেছেন।

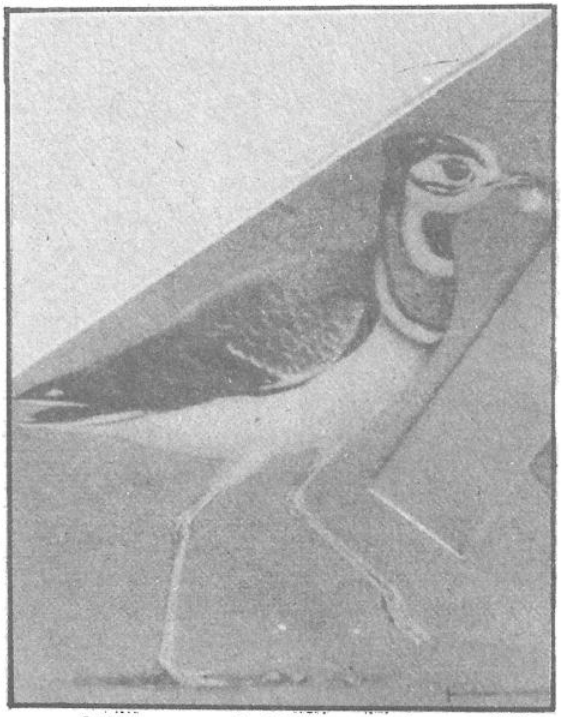

পাখিটি ধাবনকারী (Cursorsus) এবং টিটিভের (Plover) জাত ভাই। পাখিটিকে প্রথম আবিষ্কার করেন ভারতের পক্ষিতত্ত্বের জনক টি. সি জার্ডন 1884 সালে এবং তাঁর বই 'দি বার্ডস অফ ইণ্ডিয়া'র 3-য় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত করেন (pp. 628-29)। নামকরণ করেন—জার্ডন'স ক্যরসার, ডাবল-ব্যাণ্ডেড প্লোভার। তেলেগু—আদাভি আটা-টিট্টু অর্থাৎ জঙ্গলে খালি টাকার ব্যাগ (জাংগল এমপ্টি পার্স)। নাম দিয়েছি—জংলি নাকরি। লম্বায় $9\frac{1}{2}$ থেকে 10 ইঞ্চি।

বাসস্থান—জার্ডনের মতে অন্ধ্রের পেন্নার ও গোদাবরী উপত্যকা, নেলোর, কুড্ডাপ্পা, সিরোঞ্চা, ভদ্রাচলম এবং অনন্তপুরের আশপাশে। দেখা যায়, পাথুরে উঁচু নিচু জমিতে, যেখানে খুব হাল্কা জঙ্গল ও ঝোপ-আগাছা আছে। কখনও উন্মুক্ত অনুর্বর পতিত জমিতে দেখা যায় না।

সরকার একটু সচেষ্ট হলে এই অমূল্য পাখিটি রক্ষা পাবে, বংশবৃদ্ধি করবে এবং এদের সম্বন্ধে আমরাও অনেক তত্ত্ব ও তথ্য জানতে পারব।

আই-কিউ টেস্ট
অক্টো-নভেঃ '86

1. গণতান্ত্রিক স্বায়ত্ত শাসন ব্যবস্থা অনুসৃত হয়—
(a) লর্ড রিপন কর্তৃক, (b) লর্ড কার্জন কর্তৃক, (c) লর্ড ডালহৌসি কর্তৃক, (d) লর্ড মেয়ো কর্তৃক, (e) লর্ড আমহার্স্ট কর্তৃক।

2. বৃত্তের প্রতিসাম্য রেখা—
(a) 1টি, (b) 2টি, (c) 4টি, (d) অসংখ্য।

3. বাতাস থেকে রক্তে অক্সিজেনের স্থানান্তর ঘটে—
(a) শ্বাসনালীতে, (b) অ্যালভিও লাইতে, (c) বুকে, (d) এদের কোনটিতেই নয়।

4. ক্রিকেটে প্রথম শতরান করেন—
(a) টমাস লর্ড, (b) ডব্লু জি গ্রেস, (c) উইলিয়াম ল্যাম্বার্ট, (d) টমাস হার্ডিন, (e) জন স্মল, (f) রণজিৎ সিংজী।

5. যদি 28951 সংকেতটি দিয়ে South, 38051 সংকেতটি দিয়ে North, 7425 সংকেতটি দিয়ে West, এবং 4025 সংকেতটি দিয়ে East বোঝায়, তাহলে 3472 সংকেতটি দিয়ে কি বোঝাবে ?

আই-কিউ-টেস্ট/আগস্ট' 86-এর সমাধান

1. (d) রামায়ণ এবং মহাভারত।
2. [(d) (b) (e) (c) (a)].
3. (c) ল্যাকটিক অ্যাসিড।
4. (c) নিয়ন।
5. (b) 50 জন।

হাসনাহানা

এণাক্ষী বিশ্বাস

প্রায়ই পরিত্যক্ত জমিতে এই গাছটি হয়ে থাকতে দেখা যায়। ফুলের সুমিষ্ট সুরভি রাতের অন্ধকারে পথচলতি মানুষকে জানিয়ে দেয় হাসনাহানা গাছটির উপস্থিতি। রাতের অন্ধকার নেমে আসার সঙ্গে সঙ্গে হাসনাহানা তার সুমিষ্ট সুবাসে সকলেরই মন আমোদিত করে তোলে। তাইত হিন্দীতে এই ফুলগাছটির নাম 'রাত কী রানী'। ইংরাজীতে বলা হয় 'লেডি অব দি নাইট', 'নাইট জেসুমিন'। বৈজ্ঞানিক নাম সেসট্রাম নকচারনাম। লিনিয়স্ সর্বপ্রথম এই গাছটির বৈজ্ঞানিক ভাবে বর্ণনা করেন এবং সোলানেসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত করেন। আদি-নিবাস ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। বর্তমানে সর্বত্রই হয়। অনেকের বাড়িতে এই ফুল গাছটি দেখতে পাওয়া যাবে। নকচার-নাম কথার অর্থ রাত্রিতে যে ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

সারাবছরই ফুল হয় তবে বর্ষার সময় ফুলের সমারোহ ঘটে। শীতের ফুলগুলি বাহারি বা নয়নমুগ্ধকর দেখতে হয় না। ছোট ছোট সবজে সাদা ফুল মঞ্জরী দণ্ডের প্রতি শাখার সময় ফল হয়। উপরে রেসিমের মত উৎপন্ন হয় এই পুষ্পবিন্যাস যৌগিক মঞ্জরী ও ইংরাজীতে প্যানিকল নামেপরিচিত। বর্ষার সময় এই ফুলের সুবাস বহুদূর থেকেই পাওয়া যায়। প্রচলিত আছে, এই ফুলের সুবাসের মধ্যে এমনই মাদকতা আছে যে সর্পকুল সহজেই মাতাল হয়ে পড়ে। সেজন্য এই হাসনাহানা ফুল গাছে প্রায়ই সাপের দেখা মেলে।

এই হাসনাহানা ফুল গাছটি প্রায় 3 মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ। পাতা একান্তর, অনুপত্রণ পত্র, ইংরাজীতে এক্সিস্টপুলেট বলা হয়। পাতার আকৃতি ডিম্বাকার-আয়ত, সূক্ষ্মাগ্র, ফলকের সংস্থান ঝিল্লিময়। ফলক অখণ্ড ও সবৃন্তক। ফুল আকৃতিতে ছোট হয়। ফুলের চারটি অংশ আছে। বৃতি, দলমণ্ডল, পুংস্তবক ও স্ত্রীস্তবক। বৃতি উপঘণ্টাকৃতি, খুব ছোট 5টি ত্রিকোণাকৃতি দাঁতের মত অংশে বিভক্ত। দলমণ্ডল 5টি পাঁপড়িতে বিভক্ত। ফুলগুলি নলাকৃতি বা ফানেলাকৃতি, প্রায় 2 সে.মি. লম্বা, 0·2 সে.মি. বিস্তৃতি উপরদিকে। পুংস্তবক পাঁচটি থাকে এবং প্রতিটি পুংস্তবক দুইটি পাঁপড়ির মধ্যে নলের গায়ে বিদ্যমান থাকে। সঙ্গে যুক্ত দলমণ্ডলের পুংদণ্ড থাকে উপর থেকে $\frac{1}{4}$ দূরত্বে। গর্ভস্তবকে গর্ভাশয় গোলাকার গর্ভদণ্ড সূত্রাকার হয়। কালচে নীল রঙের বেরি ফল হয়। ফলের ভিতর প্রচুর বীজ হয়। ফুলের নির্যাস থেকে যে তেল জাতীয় প্রস্তুত হয় তা ঔষধি গুণসম্পন্ন।

এই ফুল গাছটির আরও দুটি প্রজাতি আছে।

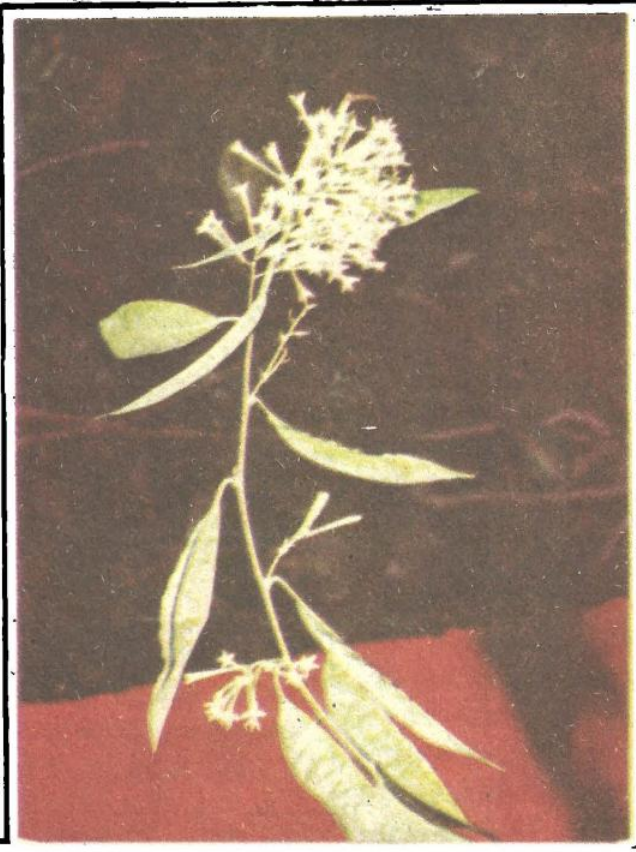

ফোটো ঃ

সুবল কৃষ্ণ দে

জীবনদায়িনী ভেষজ সর্পগন্ধা

সীমা সেন

বিশ্বের দরবারে একটি ছোট্ট জীবনদায়িনী ভেষজ আলোড়ন তুলেছে ভারতবর্ষের আয়ুর্বেদিক শাস্ত্রকে আবার নতুন করে পুনঃ জাগরিত করতে। এই জীবনদায়িনী ভেষজটির নাম সর্পগন্ধা **রাওভোলসিয়া সার্পেনটিনা**)। বহু প্রাচীনকাল থেকে বিভিন্ন আয়ুর্বেদ গ্রন্থে ভেষজটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় বিষাক্ত সরীসৃপ বা কীটপতঙ্গ দংশনে, আশ্রিক গোলোযোগে, ব্যথাশূলো ইত্যাদিতে। সাপুড়েদের কাছে এই গাছের

মূল পাওয়া যায় সর্পকুলকে বশে আনতে। বিহ 'পাগলকে দাওয়াই' নামে খ্যাত।

1952 সালে সর্পগন্ধা থেকে রিসার্পিন উপক্ষার আবিষ্কারের সাথে সাথে বিদেশে এই গাছের চাহিদা ভীষণ ভাবে বেড়ে যায়। এলোপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রিসার্পিনের ব্যবহার সর্পগন্ধার প্রয়োজনীয়তা বাড়িয়ে তুলেছে চতুর্গুণ। সর্পগন্ধা মূলত ভারতীয় ভেষজ। ফলে সমূলে সর্পগন্ধা নিধনযজ্ঞ শুরু হয়ে যায় কিছু মুনাফালোভী ব্যবসায়ী মারফৎ। এই রকম বিপদসংকুল অবস্থায় 1955 সালে ভারত সরকার বাধ্য হয়ে সর্পগন্ধা বিদেশে পাচার সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেন আইন করে। বিদেশে ঔষুধশিল্পে রিসার্পিন তৈরির ক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হয়। সর্পগন্ধার বিকল্প খুঁজে বার করার প্রতিযোগিতা শুরু হয় বৈজ্ঞানিক মহলে। সন্ধান মেলে রিসার্পিনের। সর্পগন্ধারই নিকট আত্মীয় রাওভোলফিয়া টেট্রাফাইলা আমেরিকাতে এবং রাওভোলফিয়া ভোসিটরিয়া আফ্রিকাতে সামলে দেয় সর্পগন্ধার অনুপস্থিতি।

বর্তমানে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে সর্পগন্ধার চাষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মধ্য হিমালয়ের দেরাদুনে উত্তর প্রদেশের লালকান এবং হলদিয়ানিতে; বিহারের হাজারিবাগে; তামিলনাড়ুর নীলগিরি এবং অন্নামালিতে; কেরালার কালিরিতে; আসামের জোড়হাট, নওগাঁ, গোয়ালপাড়াতে; মেঘালয়ের নাংগপু এবং তুরায়; পশ্চিমবঙ্গে রঙ্গোয় এবং কাশ্মীরের জম্মুতে সর্পগন্ধার চাষ হচ্ছে।

30 টন মত সর্পগন্ধার শুষ্কমূল বর্তমানে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়। কিন্তু রিসার্পিন এবং অন্যান্য হাইপোটেনসিভ উপক্ষারের প্রয়োজন আমাদের দেশে বছরে 200kg মত। অর্থাৎ 50 টন মত শুষ্কমূল প্রয়োজন। এ ছাড়াও বিদেশে এর চাহিদা প্রচণ্ড। বাৎসরিক 100—150 টন শুষ্ক সর্পগন্ধার মূল উৎপন্ন করতে পারলে সাময়িক প্রয়োজন মেটে। অতএব এই চাহিদা মেটাবার একমাত্র পথ সুবিধামত পরিবেশে বিশালাকারে এই গাছের চাষ।

সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট

অক্টোঃ-নভেঃ 1986

মান : IX/X

1. কোন্ নৃপতি থানেশ্বর থেকে কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেছিলেন ?
2. ভারতের জাতীয় পতাকার গৈরিক রং কিসের প্রতীক ?
3. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় কবে ?
4. 'ভারতের ম্যাঞ্চেস্টার' কোন্ শহরকে বলা হয় ?
5. কোন্ ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড় প্রথম 'অর্জুন পুরস্কার' লাভ করেন ?
6. এক অশ্বক্ষমতা = কত ওয়াট ?
7. প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় 5 গ্রাম-অণু পরিমাণ অক্সিজেনের আয়তন কত ?
8. কোন্ যন্ত্রে স্টীমের চাপ বাড়িয়ে জলের স্ফুটনাংক বাড়ানো হয় ?
9. কোন্ 'উদ্ভিদ হরমোন' বীজের অঙ্কুরোদগমে সাহায্য করে ?
10. পরিমাপের সর্বাধুনিক আন্তর্জাতিক পদ্ধতির নাম কি ?
11. মহাত্মা গান্ধী কাকে 'Man of God' বলে অভিহিত করেছিলেন ?

সিনিয়র ফটো ক্যুইজ

নিচের ছবিটা কিসের ? বুঝতে পারছ না ? একটু ইঙ্গিত দিচ্ছি। এটি একটি পৃথিবীখ্যাত মার্কিন রণতরীর ছবি। এবার দেখতো নামটা বলতে পার কিনা।

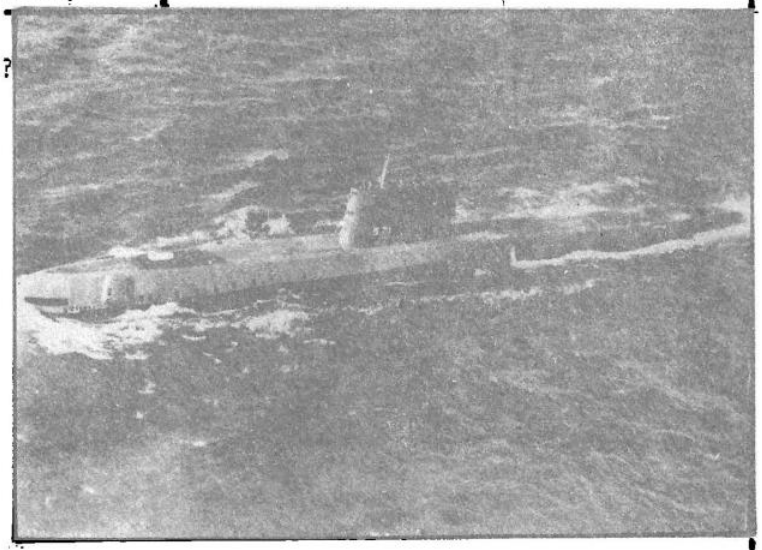

আগস্ট/86 'সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট'-এর সমাধান

1. মহানদীর উপর নির্মিত হীরাকুদ বাঁধ।
2. ভঙ্গিল জাতীয় পর্বত।
3. প্রতিস্থাপনযোগ্য হাইড্রোজেন পরমাণু।
4. প্রায় 120 দিন।
5. ভিটামিন-C
6. নিউটন।
7. (গ) M অক্ষরটি প্রতিসম বলে।
8. (গ) PO_4
9. এক রান হয়।
10. ভারতের সংবিধান।
11. বিপিনচন্দ্র পাল।
12. ফোটো ক্যুইজের সমাধান : টাটা ইস্পাত কারখানার অক্সিজেন প্ল্যাণ্ট।

গত সংখ্যার শব্দকূটের সমাধান

অ্যা	মি	বা		পা	ই	ন
লী						স্ট
ল		স	বা	ত		ক
		ব		প		
রি		জী	ব	ন		আ
কে						লো
ট	ম্যা	টো		মো	ল	ক

হাতি সমস্যা

রাজা রায়

বৃহত্তম স্থলচর প্রাণী হাতি—তাই বরাবরই হাতি নিয়ে মানুষের কৌতূহল। হাতি শুণ্ডধারী বর্গের (Order Proboscidea) অন্তর্গত। গত চার কোটি বছরে শুণ্ডধারী বর্গের 330টি প্রজাতি পৃথিবীতে এসেছে কিন্তু টিকে আছে মাত্র দুটি—আফ্রিকান হাতি (Loxodonta africana) ও ভারতীয় হাতি (Elephas maximus)। আফ্রিকান হাতি আকারে বড়, গড় ওজন প্রায় আট টন। ভারতীয় হাতি তুলনায় ছোট, গড় ওজন ছয় টন।

বিশেষ করে এই শতাব্দীতে জনসংখ্যা বাড়বার ফলে বনাঞ্চল কমে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গেই কমে এসেছে হাতির খাদ্য ও বাসোপযোগী পরিবেশ। অনেক ক্ষেত্রেই হাতি জঙ্গলের খাদ্য শেষ করে ফেলছে, গাছপালা ভেঙে পরিবেশ নষ্ট করছে—তারপর হানা দিচ্ছে গ্রামাঞ্চলে খেতখামারে। শস্য নষ্ট হচ্ছে, কৃষকরা বাধা দিচ্ছে, দুচার জন মারাও পড়ছে। উঠছে তুমুল প্রতিবাদের ঝড়। মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদে হাতিও মারা পড়ছে। হাতিকে নিয়ে সমস্যার এটাই আসল চেহারা।

এ সমস্যার মূল কোথায়? হাতির খাদ্য জঙ্গলে কমে যাওয়াই কি তাদের লোকালয়ে হানা দেবার কারণ? সমস্যা সমাধানের পথ কোথায়? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজছেন গত কয়েক বছর ধরে বিজ্ঞানীরা—লস্, এলিট্রংহাম, ডগলাস—হ্যামিল্টন প্রভৃতি এঁদের মধ্যে মুখ্য। অবশ্য মূল গবেষণা প্রায় সবটাই হয়েছে আফ্রিকাতে। তবে কিছু সিদ্ধান্ত ভারতের ক্ষেত্রেও টানা যায় বই কি!

গবেষকরা আগে হাতির দল, তাদের বিচরণক্ষেত্র, আচার আচরণ ও খাদ্য সম্পর্কে খোঁজ করেছেন। দেখা গেছে হাতির দল প্রধানতঃ দুই ধরনের—বয়স্কা মাদী হাতির নেতৃত্বে পারিবারিক গোষ্ঠী ও পুরুষ হাতির দল। পারিবারিক গোষ্ঠীতে থাকে গড়ে 10টি হাতি—গড়ে একটি বয়স্ক পুরুষ হাতি, 3/4 টি মাদী হাতি, 5/6 টি বাচ্চা। 30—40 বছর বয়সী পুরুষ হাতিরা সাধারণতঃ দল ছেড়ে বেরিয়ে একা বা দুই-তিন জন সঙ্গীর সাথে থাকে। এরকম ক্ষেত্রে গড় সভ্য সংখ্যা 2 এবং অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ হাতিরা একলাই থাকে। সুতরাং একলা হাতি মানেই গুণ্ডা হাতি এ ধারণা ভুল।

হাতির দল তাদের খাদ্য সংগ্রহ ও অন্যান্য কাজে একটা বিশেষ এলাকার মধ্যে ঘোরে। এই এলাকাটি তাদের বিচরণক্ষেত্র বা 'হোম রেঞ্জ' (Home range)। ডগলাস—হ্যামিল্টন লেক মানিয়ারা অঞ্চলে 48 টি দলকে দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ করে তাদের গড় রেঞ্জ মাপেন 40 km^2। অথচ পূর্ব সাভো ন্যাশনাল পার্কে গড় রেঞ্জ 350 km^2

আর পশ্চিম সাভোতে 1540 km^2! এই বিপুল পার্থক্য বৈজ্ঞানিকদের বেশ বিপাকে ফেলে দেয় যদিও অনুমান করা হয় যে এলাকার আবহাওয়া আর সবুজ ঘাসপাতার পরিমাণের উপর রেঞ্জ নির্ভরশীল। এটাও এই প্রসঙ্গে আবিষ্কৃত হয় যে, শুধু হাতি নয় অনেক প্রাণীরই রেঞ্জের একটা বড় অংশ পড়ে অভয়ারণ্যের বাইরে। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই তাদের অভয়ারণ্যের বাইরে যেতে হয়।

সাধারণ অবস্থায় হাতি বেশ আয়েসী প্রাণী - সারাদিনে চলে গড়ে মাত্র 3km, গড় বেগ 0·129 km/hour। দিনে 17 ঘণ্টাই তারা খায়, 4 ঘণ্টা ঘুমায় ও বাকী সময় অন্যান্য কাজ করে। এই কাজ করতে ও তাদের বিরাট শরীর রক্ষা করতে হাতি খায় দৈনিক গড়ে 200 কেজি ঘাসপাতা। বড় গাছ, ঝোপঝাড়, ঘাস কিছুই তারা বাদ দেয় না। মোট 60—100 প্রজাতির উদ্ভিদ এক একটি দল খায়।

জঙ্গলে খাদ্যের যোগান আর হাতির সংখ্যার হিসাব থেকেই জঙ্গলের ধারণ-ক্ষমতার একটা আন্দাজ পাওয়া যায়। রুয়োঞ্জারি ন্যাশনাল পার্কে হিসাব করে দেখা গেছে যে প্রতি বর্গ কিলোমিটারে 186,740 kg ঘাসপাতা উৎপন্ন হয় বছরে এবং এর শতকরা 9.5% মাত্র হাতিতে খায়। ৎসাভো ন্যাশনাল পার্কের ক্ষেত্রে অনুরূপ হিসাব শতকরা 11.8%। এর থেকে অনুমান করা যায় যে বর্তমান হাতির সংখ্যার প্রায় দশ গুণ পর্যন্ত এই জঙ্গলে থাকতে পারে এবং হাতি সমস্যা এখানে তুলনামূলকভাবে কম। কিন্তু আদতে (বিশেষ করে ৎসাভো ন্যাশনাল পার্কে) ব্যাপারটা ঠিক এর উল্টো!

হিসাবে গরমিলের কারণ অনেকগুলি। সব ঘাসপাতা হাতি খায় না। হাতি ছাড়া অন্যান্য তৃণভোজী প্রাণীদেরও প্রয়োজন মেটাতে হয় ঐ জঙ্গলকে। যেমন হাতির দলগুলির রেঞ্জ কিছুটা ন্যাশনাল পার্কের বাইরে পড়ে, তেমনি ন্যাশনাল পার্কের কিছুটা কোনো দলের রেঞ্জই পড়ে না এবং সেখানকার ঘাসপাতা হাতিদের কোনো কাজে আসে না। এ ছাড়া আরেকটা জটিলতা আছে—হাতিরা অনেক গাছ নষ্ট করে শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে বা গাছের ছাল ছাড়িয়ে। ফলে সব গাছ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না এবং পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ সমস্যাটি যে অত্যন্ত তীব্র তা বিভিন্ন ন্যাশনাল পার্ক এলাকায় গাছ-সুমারি করে দেখা গেছে। সব গাছ অবশ্য নষ্ট হয় না—সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাওবাব আর বিভিন্ন প্রজাতি বাবুল (Acacia) গাছ। ক্ষতির পরিমাণ? বিভিন্ন ন্যাশনাল পার্কে পাঁচ বছরের মধ্যে শতকরা 30 থেকে 50 ভাগ গাছ নষ্ট হয়েছে।

ঠিক কেন যে হাতিরা গাছ নষ্ট করে তা জানা নেই। অনেকে মনে করেন তারা ক্যালসিয়াম বা অন্য প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থ সংগ্রহের জন্যই এটা করে। আবার কাফালি, ফিলিপসন প্রভৃতি কয়েকজন বিজ্ঞানী মনে করেন যে গাছ ও হাতির সংখ্যা খাদ্য ও খাদক হিসাবে একটা চক্রে পরিবর্তিত হয়। হাতির সংখ্যা যখন খুব বেড়ে যায়, তুলনায় খাদ্য কম হয়ে যায়, তখন স্বাভাবিক কারণেই বহু

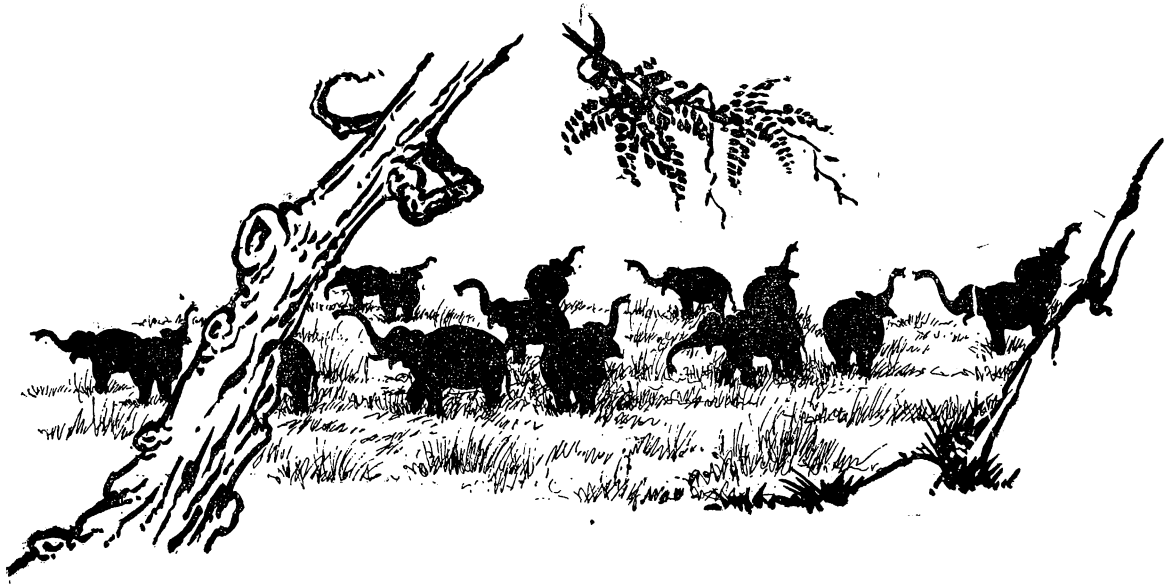

হাতির মৃত্যু ঘটে। হাতির সংখ্যা খুব কমে যায় এবং তারপর গাছপালা বাড়তে থাকে খুব বেশি হারে। চক্র শেষ হবার সময়ে আবার হাতির সংখ্যা বাড়বে হুড় হুড় করে আর গাছের সংখ্যা অত্যন্ত কমে যাবে। কাফ্‌লির হিসাবে পুরো চক্রটা চলতে সময় লাগে প্রায় 200 বছর এবং এই ব্যাপারটা প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষার একটি নজির মাত্র। এই মতবাদের গুরুত্ব হল এই যে গোটা ব্যাপারটাই প্রাকৃতিক এবং হাতির সংখ্যাবৃদ্ধির সময়ে চিন্তিত হয়ে অনেক হাতি মেরে ফেলার কোনো দরকার নেই—বরং সেটাই ক্ষতিকারক হবে।

এই মতবাদ নিয়ে আজও আফ্রিকায় গেম রেঞ্জারদের মধ্যে ও বিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্কের শেষ নেই। অনেকেই মনে করেন যে উপরোক্ত কারণগুলির জন্য যখনই বনের ধারণ-ক্ষমতার তুলনায় হাতির সংখ্যা বেশি হয়ে যাবে তখনই বেশ কিছু হাতি মেরে ফেলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এই ধরনের হাতি (বা অন্য বন্যপ্রাণী) মেরে ফেলার নাম দেওয়া হয়েছে 'গেম কালিং'। লস্ প্রমুখ বিজ্ঞানীদের পরামর্শ অনুসারে উগাণ্ডা, কোনিয়া, জাম্বিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় 'কালিং' করা হয়েছে এবং অনেক ন্যাশনাল পার্কে নিয়মিত করা হচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বিখ্যাত ক্রুগার ন্যাশনাল পার্কে 1971 থেকে 1974 সালের মধ্যে 4000 হাতি মারা হয়েছে। জিম্বাবওয়েতে প্রতি বছর 3% থেকে 4% হাতি মারা হচ্ছে যাতে হাতির সংখ্যা 30,000 এ-ই স্থির থাকে। জাম্বিয়ার সাউথ গেম রিজার্ভে ষাটের দশকের শেষে 1464 টা হাতি মারা হয় কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে 1964 থেকে 1979 সালের মধ্যে হাতির সংখ্যা হয়ে গেছে ডবল। হয় তো আরো ব্যাপক হারে 'কালিং' প্রয়োজন!

নতুন পদ্ধতিতে 'ডার্ট গান' ব্যবহার করে হাতি মারা নিঃশব্দ ও 'কালিং'-এর প্রবক্তাদের মতে নৃশংস নয়। 12টি হাতির একটি দলকে সম্পূর্ণ মারতে সময় লাগছে 45 থেকে 90 সেকেণ্ড মাত্র! তা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবেই সংরক্ষণপন্থীরা 'কালিং'-এর বিরুদ্ধে। তাঁদের একটা বড় যুক্তি এই যে 1979 সালে আফ্রিকায় হাতির সংখ্যা সাড়ে তের লক্ষ হলেও 35 টির মধ্যে 28 টি দেশে হাতির সংখ্যা কমছে। ংসাভো ন্যাশনাল পার্কে 'কালিং' করা হবে ঠিক করার পর বিরোধীদের বাধাদানে তা কার্যকর করা হয়নি। 1970-71 সালে ভয়ঙ্কর খরা হয় আর তার ফলে অন্ততঃ 6000 হাতি খাদ্যের অভাবে মারা পড়ে। বিতর্কের কিন্তু শেষ হয় নি! সংরক্ষণ পন্থীরা বলছেন যে এটাই প্রাকৃতিক ভারসাম্য আনার উপায় আর 'কালিং'-পন্থীরা বলছেন যে তিন চার হাজার হাতি আগে মেরে ফেললে এই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে 6000 হাতি মারা পড়ত না।

সমরজিৎ করের

নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী

তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে ॥ ২০ টাকা

পরিশিষ্টে

১৯০১—১৯৮৫ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রাপকগণের তালিকা সংযোজিত।

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগ 86/1 মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-9

আমাদের দেশের অবস্থা? এই তথ্যের অনেকই ঠিক ভারতের পক্ষে খাটবে না। কিন্তু এটা পরিষ্কার যে উত্তর বাংলার অভয়ারণ্যগুলি আয়তনে অত্যন্ত ছোট—জলদাপাড়া 115 km^2, মহানদী 127 km^2, চাপড়ামারি 8.8 km^2 আর গোরুমারা মাত্র 8.6 km^2। যদি গড় রেঞ্জ 100 km^2 ও ধরা যায় তো এই এলাকাগুলি হাতির মতন বড় প্রাণীর পক্ষে একেবারেই অপ্রতুল। কাজেই স্বাভাবিক কাজে হাতিদের অভয়ারণ্যের বাইরে যেতেই হবে আর সেখানে তাদের সাধারণ বিচরণ ক্ষেত্রের মধ্যে গড়ে উঠেছিল গ্রাম, ক্ষেত, চা-বাগান! তার থেকেই হাতি বনাম মানুষ যুদ্ধের সূত্রপাত! ভারতে সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য হাতি মারা হয় না—ফসল নষ্ট বা মানুষ মারার জন্য দাগী গুণ্ডা হাতিকেই মারা হয়। বর্তমান পরিস্থিতিতে পরিবেশের সঙ্গে হাতির ভারসাম্য পরিস্থিতি আসারও কোনো সম্ভাবনা নেই। এইজন্যই অনেকেই মনে করেন যে আসাম আর দক্ষিণ ভারত ছাড়া ভারতীয় হাতির বংশরক্ষা বোধ হয় অসম্ভব!

C/o. শিখা রায়, 1/14 প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড কলকাতা-26।

আয়নার কথা

প্রতাপ চট্টোপাধ্যায়

আলো সরলরেখায় গমন করে। যখন কোনও বস্তুর ওপর আলোকরশ্মি পতিত হয় তখন ওই বস্তুর ধর্মের ওপর নির্ভর করে তিন ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে ঃ ওই বস্তুদ্বারা আলোক শোষিত হতে পারে, প্রতিফলিত হতে পারে বা, প্রতিসরিত হতে পারে।

যে বস্তুদ্বারা আলোক প্রতিফলিত হয় তাকে সাধারণভাবে প্রতিফলক বলে। কোনও প্রতিফলক থেকে প্রতিফলিত আলোকরশ্মি যদি কোনও রূপ বিক্ষিপ্ত না হয় তবে ওই প্রতিফলক দ্বারা যে কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব দর্শন সম্ভব। বহু বস্তুই এই ধরনের নিয়মিত প্রতিফলকের কাজ করতে পারে। সরোবরের স্থির জলে প্রতিবিম্ব দর্শন তো মানুষের অনাদিকালের অভিজ্ঞতা।

স্থির জলে আপতিত আলোকের সামান্য অংশই প্রতিফলিত হয়। সেজন্য প্রতিফলক হিসাবে জল তেমন কার্যকরী নয়। অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে টিন, অ্যালুমিনিয়াম, সিলভার ইত্যাদি ধাতুর মসৃণ পাত প্রতিফলক হিসাবে খুব ভালো কাজ করে। এই ধরনের ধাতুর একটি সুমসৃণ পাতই আমাদের চিরপরিচিত নিয়মিত প্রতিফলক আয়নার মূল উপাদান।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় আয়না একটি মসৃণ সমতল কাচ মাত্র। কিন্তু কাচ আয়নার মূল উপাদান নয়—মূল উপাদান একটি অতিসূক্ষ্ম মসৃণ ধাতব পাত। কাচ তার ধারক মাত্র। মসৃণ কাচের একপৃষ্ঠে এই ধাতব পাত সুকৌশলে লেপন করা হয়। বায়ু মাধ্যম থেকে যখন আলোকরশ্মি সমতল কাচের ওপর লম্বভাবে আপতিত হয় তখন মাত্র সাড়ে চার শতাংশ আলোক প্রতিফলিত হয়। পক্ষান্তরে মসৃণ ও সমতল ধাতব পাতে লম্বভাবে আপতিত আলোকের প্রতিফলন মাত্রা শতকরা পঁচাত্তর ভাগ। সেজন্য আয়নার উপাদান হিসাবে ধাতব পাত কাচ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠতর।

আয়নার ধাতব পাত হিসাবে 1840 খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত টিন ও পারদের একটি ধাতু সংকর ব্যবহার করা হতো। কিন্তু 1835 খৃস্টাব্দে রসায়ন বিজ্ঞানী লিবিগ লক্ষ্য করেন যে পরিষ্কার কাচনলে অ্যামোনিয়া যুক্ত সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের সঙ্গে গ্লুকোজ ইত্যাদি বিজারক পদার্থ মিশ্রিত করে উত্তপ্ত করলে উৎপন্ন সিলভার কাচনলের গায়ে চকচকে অবস্থায় সঞ্চিত হয়, ফলে কাচনলটি একটি নলাকার আয়নায় পরিণত হয়।

বিজ্ঞানী লিবিগের এই আবিষ্কার আয়না শিল্পে যুগান্তর সৃষ্টি করে। পুরাতন টিন ও পারদ পদ্ধতি অচিরেই পরিত্যক্ত হয়। বিগত দেড় শতাব্দী ধরে আয়না প্রস্তুতের জন্য লিবিগ আবিষ্কৃত পদ্ধতিই বিশ্বজুড়ে অনুসৃত হয়ে আসছে। বর্তমানে একটি আধুনিক আয়না কারখানায় আয়না প্রস্তুতি নিম্নলিখিত কয়েকটি ধাপে সম্পন্ন হয় ঃ

(1) কাচের কারখানা থেকে প্রাপ্ত কাচের পাত যথেষ্ট এবড়োখেবড়ো হয়। কিন্তু ভালো আয়না প্রস্তুতের অন্যতম শর্ত হলো আয়নার কাচটি বিন্দুমাত্র এবড়োখেবড়ো হবে না। এবড়োখেবড়ো হলে প্রতিবিম্ব বাঁকা তেড়া হবে। সেজন্য প্রান্ত কাচের পাতকে অনুভূমিক অবস্থায় রেখে সূক্ষ্ম চূর্ণীকৃত অপঘর্ষক দিয়ে ভালোভাবে ঘষা হয়, যাতে কাচের পাত মসৃণ হয়। এরপর পাতটি প্রথমে সাবান জল দিয়ে ও পরে পাতিত জল দিয়ে ভালোভাবে ধোওয়া হয়।

(2) সাত শতাংশ সিলভার নাইট্রেটের একটি জলীয় দ্রবণে ধীরে ধীরে অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করা হয়। প্রথমে একটি বাদামী অধঃক্ষেপ দেখা দেয়। ওই অধঃক্ষেপ অতিরিক্ত অ্যামোনিয়া দ্রবণ দ্রবীভূত হয়ে যায়। কিছু পাতিত জল ঢেলে দ্রবণের মোট আয়তন সিলভার নাইট্রেট দ্রবণের দ্বিগুণ করা হয়। এবার ওই দ্রবণে গ্লুকোজ ফরম্যালডিহাইড রাশিলি লবন বা ওই জাতীয় বিজারক পদার্থের দ্রবণ যোগ করা হয়।

(3) আয়নাকরণের জন্য উপরোক্ত সদ্যপ্রস্তুত দ্রবণ কাচের পাতের ওপর ঢেলে পাতটিকে সুষমভাবে আবৃত করা হয় এবং সে অবস্থায় কিছুক্ষণ রেখে দেওয়া হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সিলভার নাইট্রেট বিজারিত হয়ে কাচের ওপর রূপার একটি হাল্কা প্রলেপ সৃষ্টি করে। এবার অতিরিক্ত বিজারক দ্রবণ ঢেলে ফেলে কাচের পাতটিকে পাতিত জল দিয়ে ভালোভাবে ধোওয়া হয়। যেহেতু রূপার ওই প্রলেপটি খুবই পাতলা এবং সহজে সরে যেতে পারে সেজন্য সেটিকে রক্ষণের উদ্দেশ্যে রূপার ওপর মোটা করে তামা তড়িৎ লেপিত করা হয়। তবে সস্তা আয়নার ক্ষেত্রে খরচসাপেক্ষ তামার তড়িৎ-লেপনের বদলে রূপার প্রলেপের ওপর মেটে সিঁদুরের (রেড লেড্) প্রলেপ লাগানো হয়। সবশেষে কাচের পাতটিকে পছন্দমত ফ্রেমে আটকে বাজারে চালান দেওয়া হয়।

অধ্যাপক, বারাসাত রাষ্ট্রীয় মহাবিদ্যালয়, বারাসাত।

অটোম্যাটিক টাইমার সার্কিট

সুরজিৎ সাহা

CIRCUIT DIAGRAM

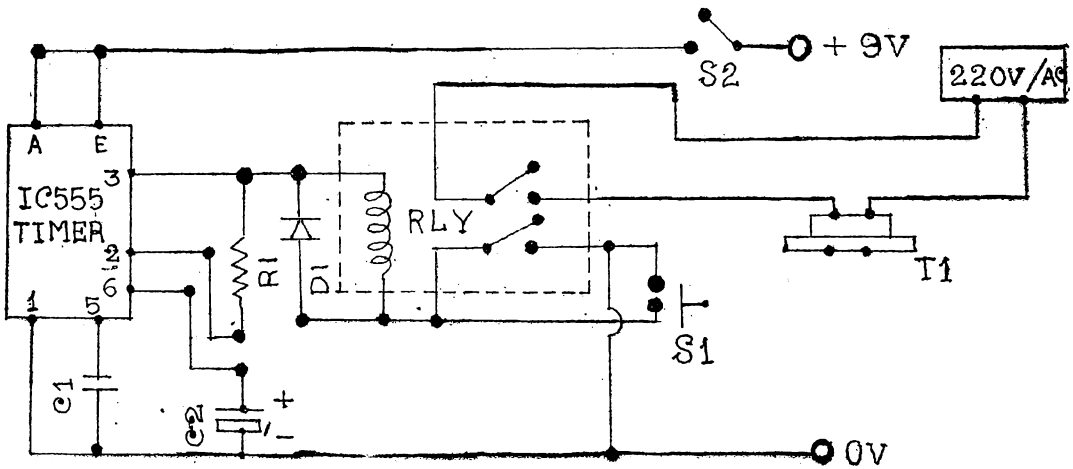

আজ তোমাদের একটা নতুন মডেল তৈরি করা শেখাব। এই যন্ত্রটিতে তোমরা যে কোন Electronic unit যেমন Radio, Tape recorder ইত্যাদি যুক্ত করলে নির্দিষ্ট সময় পরে (এখানে পাঁচ মিনিট) সেটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

সমস্ত circuit-এর গঠন প্রণালী খুবই সহজ। সমস্ত circuitটি (relay, switch, plugbase বাদে) IC ভেরো বোর্ডে তৈরি করে ফেলা যাবে। IC 555টি ভেরো বোর্ডে সরাসরি বসিয়ে ঝালাই করবে না। এর জন্য IC-Base কিনতে পাওয়া যায়। সমস্ত পার্টস, IC Base ভেরো বোর্ডে বসিয়ে ঝালাই করে তারপর ICটি বেসে বসাবে। প্রতিটি ঝালাই যত্ন করে সাবধানে করবে, কারণ ঝালাই করা খারাপ হলে circuit ঠিক থাকা সত্ত্বেও যন্ত্র কাজ করবে না।

এবার যন্ত্রটি কিভাবে কাজ করে বোঝা যাবে। প্রথমে একটি Tape Recorder-এর playpin T1 সকেটে ঢুকিয়ে S1 সুইচ অন কর। সাটারণ অবস্থায় Relay off থাকে তাই টেপ চলবে না। এবার S1 সুইচ পুশ করলে Timer IC 555 Relayটিকে চালু করবে, ফলে বাজতে শুরু। ঘড়ির দিকে লক্ষ্য কর। ঠিক পাচ মিনিট পর দেখবে টেপ স্বয়ংক্রিয় ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

তোমরা যদি এই বন্ধ হবার সময়টিকে রদবদল করতে চাও তবে RI-এর মান এবং CI-এর মান (voltage ঠিক রেখে) তোমাদের প্রয়োজন মতো পরিবর্তন করে দেখবে। সমস্ত circuitটি 9 V DCতে চলে, এর জন্য তোমরা এলিমিনেটর ব্যবহার করবে।

Circuit-এর জন্য প্রয়েজেনীয় যন্ত্রাংশ ঃ—

(1) IC 555
(2) DI—OA79 Diode
(3) R1—220 K $\frac{1}{2}$W Resister
(4) C1—·01 mfd Condencer
(5) C2—1000mfd/12V—„
(6) Relay—9V, 180Ω, DPST

এছাড়া Push Buttum switch, switch, IC ভেরো বোর্ড, IC Base, গ্লাস বেস, তার, সোল্ডার ইত্যাদি।

18/1 পূর্বাশা হাউসিং Estate
100 মানিকতলা মেইন রোড, কল-54

টুইংক্লিং লাইট

মলয় খাটুয়া

তোমাদের আজ একটা মজার খেলনা তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে দেবো। খুব কম খরচাতেই মডেলটি তৈরি করা যাবে। এটি তৈরি করতে নিম্নলিখিত যন্ত্রাংশগুলো লাগবে।

1. Transistor (ট্রানজিস্টর)
   AC 176 2টি
2. Resistance (রেজিস্ট্যান্স)
   10K 2টি
3. Capacitor (ক্যাপাসিটর)
   100μ 12V 2টি
4. Light Emitting Diode (LED)
   লাল 4টি, সবুজ 4টি

এছাড়া কিছু তার, ঝালাইয়ের যন্ত্রপাতি ইত্যাদি।

প্রয়োজনীয় যন্ত্রাংশগুলো যে কোনো ইলেকট্রনিক্স পার্টসের দোকানে পাওয়া যাবে। মডেলটি 20 টাকার মধ্যে তৈরি করা যাবে।

এই সার্কিটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দুটি ট্রানজিস্টরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ চললে ডানদিকের ট্রানজিস্টরের মধ্যে দিয়ে প্রবাহ বন্ধ থাকে এবং তারপরেই বিপরীত প্রক্রিয়া ঘটে। ফলে লাল ও সবুজ আলোগুলো মিটমিট করে জ্বলবে। মডেলটি 1·5 ভোল্ট এর 4টি ব্যাট্টারি অর্থাৎ 6 Volt DC তে চলবে।

LED গুলোকে মোটা কাগজের বোর্ডে গোল করে লাগালে দেখতে ভালো লাগবে। অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে ট্রানজিস্টর দুটির উপর মোড়া ধাতবপাত (Heat Sink)

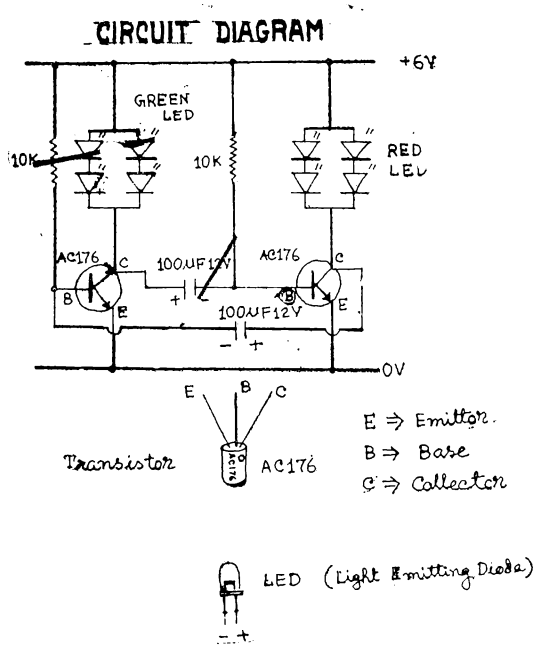

Circuit Diagram অনুযায়ী কানেকশন করলেই কাজ শেষ। Soldering-এর সময় Transtsior-এর Emitter Base, Collector সঠিক জায়গায় যুক্ত করতে হবে। এছাড়া ডায়োড ও ক্যাপাসিটারের Positive ও Negative প্রান্ত খেয়াল রাখতে হবে।

লাগানো যেতে পারে। মোট খরচ পড়বে সতের টাকার মতো।

ডাক ও গ্রাম—মোল্লাহাট
হাওড়া—পিন 711314

শব্দকুট

সুকৃৎ ঘোষ

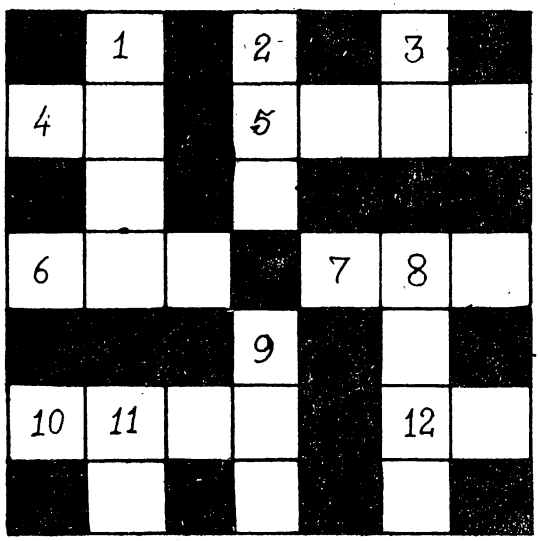

পাশাপাশি ঃ

4. টেলিফোনের আবিষ্কর্তা।
5. ইউরেনিয়ামের তেজস্ক্রিয়তা যিনি আবিষ্কার করেন।
6. অস্মিয়াম মৌলটির আবিষ্কারক।
7. 'রেনিয়াম' মৌলটি যিনি আবিষ্কার করেন।
10. 'X-ray'-এর আবিষ্কর্তা।
12. ইথার-এর আবিষ্কারক।

উপর-নীচ ঃ 1. তাপমাত্রার চরম স্কেলের প্রবর্তক, 2 ডিনামাইটের আবিষ্কারক, 3. উল্টালে ম্যালেরিয়ার জীবাণু যিনি আবিষ্কার করেন, 8. মোটার গাড়ির টায়ার এঁনারই আবিষ্কার, 9. মোটর গাড়ি যিনি আবিষ্কার করেন, 11. উল্টালে 'সেফ্‌টিপিন'-এর আবিষ্কর্তা।

সিউড়ি, বীরভূম।

অদৃশ্য খেলোয়াড়

পূজো সংখ্যায় সিদ্ধার্থ ঘোষ ও সমীর মণ্ডল পরিকল্পিত বিশেষ শারদীয় উপহার আশা করি সবাই পেয়েছো। কিভাবে খেলাটি করা সম্ভব হচ্ছে তার কলাকৌশল আগামী ডিসেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হবে ॥ **সম্পাদক**

কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ আয়োজিত

বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

৫ম থেকে দ্বাদশশ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পত্রিকার সহযোগিতায় কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছে। প্রতিটি পর্যায়ের প্রতিটি বিভাগের জন্য মোট ৩টি করে পুরস্কার ও সার্টিফিকেট অর্পণ করা হবে। সকল প্রতিযোগীদের নাম ঘোষণা করা হবে মার্চ '87 সংখ্যায়। রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ 31 জানুয়ারি 1987। আগামী এপ্রিল / মে মাসে অনুষ্ঠিত হবে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের বার্ষিক অনুষ্ঠানে সকল প্রতিযোগীদের পুরস্কার অর্পণ করা হবে। প্রতিযোগিতার শর্ত ও ফর্ম যথাযথ পূরণ করে না পাঠালে প্রেরিত রচনা বাতিল হয়ে যাবে।

৫ম ও ষষ্ঠ শ্রেণী ঃ প্রবন্ধের বিষয় ॥ পাখি
গল্প ও প্রবন্ধ রচনার শব্দ সংখ্যা—২০০

৭ম ও ৮ম শ্রেণী ঃ প্রবন্ধের বিষয় ॥ কুসংস্কার
গল্প ও প্রবন্ধ রচনার শব্দ সংখ্যা—300

৯ম ও ১০ম শ্রেণী ঃ প্রবন্ধের বিষয় ॥ মহাকাশ গবেষণায় ভারত
গল্প ও প্রবন্ধ রচনার শব্দ সংখ্যা 400

একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী ঃ প্রবন্ধের বিষয় ॥ প্রযুক্তি বিদ্যায় ভারত
গল্প ও প্রবন্ধ রচনার শব্দ সংখ্যা 500

পুরস্কৃত রচনাগুলি কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞানের পাতায় প্রকাশিত হবে। রচনা পাঠাতে হবে ঃ

সম্পাদক ঃ কিশোর বিজ্ঞান পরিষদ
86/1, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—9

প্রতিযোগিতার কুপন

আমি..... বিদ্যালয়ের .....শ্রেণীর ছাত্র। বয়স..... ।

৫ম / ষষ্ঠ শ্রেণীর গল্প / প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার জন্য আমার রচনাটি পাঠালাম।

স্বাক্ষর.....

শ্রীমান ..... বিদ্যালয়ের ..... শ্রেণীর ছাত্র। স্বাক্ষর.....
স্ট্যাম্প.....

নিশ্চিত সাফল্য

১ টাকার বিনিময়ে
সপ্তাহের প্রতি বুধবার
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী দিচ্ছে

প্রথম পুরস্কার

১,৫০,০০০ টাকা

আরও হাজার হাজার পুরস্কার

প্রতি বুধবার পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে, নির্দিষ্ট সময়ে খেলা হয়।

আপনার সাদর আমন্ত্রণ

আরো জানবার জন্য ঃ

অধিকর্তা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য লটারী

৬৯ গনেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলকাতা-৭০০ ০১৩ ফোন ঃ ২৬ ৪৬৮৮/২৬ ৪৬৮৯

ছোটদের দপ্তর

পরিচালনায় ● জয়ন্ত দত্ত

আগস্ট '86-এ প্রকাশিত আই-কিউ-টেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর প্রদানের জন্য (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা সার্টিফিকেট পাবে ঃ

1. অসীম ব্যানার্জী
   P/25, শরৎ চন্দ্র রোড,
   দুর্গাপুর 5, বর্ধমান।

2. দেবজ্যোতি পানি
   B_2/80/2 (V. K. Nagar)
   দুর্গাপুর—10, বর্ধমান।

3. স্নিগ্ধা উপাধ্যায়
   2/29, শান্তিপথ, সি-জোন,
   দুর্গাপুর-5, বর্ধমান।

4. সুধাংশু ঘোষ
   A 3-4/2, V. K. Nagar
   দুর্গাপুর—10, বর্ধমান।

5. নীলাদ্রি নাথ
   প্রযত্নে, নকুলেশ্বর নাথ
   আর. কে. কলেজ
   পোঃ—কৈলাশহর, উত্তর ত্রিপুরা।

আগস্ট '86-তে প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টে—সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যারা পুরস্কৃত হবে ঃ

1. ডরোথি ঘোষ
   6/2 কলেজ রোড, বি. ই. গার্ডেন,
   হাওড়া-711103
2. অনির্বাণ দাস
   প্রযত্নে, সুখরঞ্জন দাস
   I/H-9, অশ্বিনী নগর, কলকাতা-700 059
3. জয়ন্ত দত্ত মজুমদার
   খড়্গপুর কলেজ কোয়ার্টার
   পোঃ – ইন্দা, খড়্গপুর, মেদিনীপুর।

আগস্ট '86-তে প্রকাশিত জুনিয়র ফটো ক্যুইজ এর সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিনজন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. অনির্বাণ দত্ত
   4/26, আফতরর মস্ক লেন, কলকাতা-700 027
2. পীযূষ কান্তি বিশ্বাস
   পোঃ—জগাছা, মৌরীগ্রাম, জেলাঃ – হাওড়া।
3. জয়াতি দত্ত
   প্রযত্নে, যূথিকা দত্ত
   241/10, ঝিল রোড, কাশীপুর,
   ওল্ড ঝিল কোয়ার্টার, কলকাতা—700 002

আগস্ট '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট-এর সবকটি প্রশ্নের উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ রাজর্ষি পাল মজুমদার, গোপীনাথ ধর, ইন্দ্রশ্রী জানা, পার্থ দাস, রাজর্ষি সেনগুপ্ত।
24-পরগনা ঃ শুভঙ্কর বিশ্বাস, অরূপ ঢালী, সব্যসাচী ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্য, দেবানীক ঘোষ, তপন কুমার মণ্ডল। বর্ধমান ঃ মহুয়া দাঁ, স্বাতী আচার্য, গার্গী পানি, অশোক মুখার্জী।
মেদিনীপুর ঃ আশিস কুমার মাইতি, প্রদীপ দাস, অপূর্ব কুমার সামন্ত।
নদীয়া ঃ অনিরুদ্ধ সরকার, প্রিয়ব্রত বিশ্বাস, মৈত্রেয় মণ্ডল।
বাঁকুড়া ঃ রাজেশ সিংহ, রূপাঞ্জন সাহা। কোচবিহার ঃ রথীন্দ্রনাথ হিসারিয়া।
জলপাইগুড়ি ঃ সিদ্ধেৎসু রঞ্জন দাস, অংশুমান চৌধুরী। দার্জিলিং ঃ ধ্রুবদাস মহলানবীশ।

আগস্ট '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ফটো ক্যুইজ কনটেস্ট এর সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর যারা দিতে পেরেছে ঃ

24-পরগনা ঃ সন্দীপ কুমার বিশ্বাস। হাওড়া ঃ সৈকত বিশ্বাস।
হুগলী ঃ মানস কুমার সান্যাল, ভাস্কর দে জলি সাহা। নদীয়া ঃ প্রিয়ব্রত বিশ্বাস।

ভ্রম সংশোধন ঃ জুন '86-এ প্রকাশিত জুনিয়র ক্যুইজ কনটেস্টের দ্বিতীয় পুরস্কার প্রাপকের নাম রাজশ্রী সেনগুপ্তের পরিবর্তে রাজর্ষি সেনগুপ্ত পড়তে হবে। মুদ্রণ প্রমাদের জন্য আমরা দুঃখিত। পরিচালক

আগস্ট '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ক্যুইজ কনটেস্ট এর সব কটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়ে (আগে আসার ভিত্তিতে) যে তিন জন পুরস্কৃত হবে ঃ

1. প্রসেনজিৎ রঞ্জন অধিকারী
প্রযত্নে, প্রভাস চন্দ্র অধিকারী
গ্রাম—বেলদা (ওল্ড কণ্টাই রোড)
পোঃ—বেলদা, মেদিনীপুর-721424

2. দিলীপ দাস
প্রযত্নে, করুণাময় দাস
গ্রাম—উটপাথার
পোঃ—নিমপুরা, মেদিনীপুর

3. বরুণ বিশ্বাস, প্রযত্নে, সূর্যকান্ত বিশ্বাস, পোঃ+গ্রাম—জগৎবল্লভ পুর (সুকান্ত পল্লী), জেলা—হাওড়া।

আগস্ট '86-তে প্রকাশিত সিনিয়র কুইজ কনটেস্টে সবকটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর আরও যারা দিতে পেরেছে ঃ

কলকাতা ঃ অনিন্দ্য দাস, চিন্ময় ঘোষ, বিশ্বজিৎ কর্মকার, সব্যসাচী বিশ্বাস, সঞ্জয় কুমার মন্ডল, দেবযানী মুখার্জী, দেবযানী কর, শীর্ষেন্দু গুহ মজুমদার, তারকনাথ দাস, দীপঙ্কর ব্যানার্জী, দীপ্তিরাণী সামন্ত, মুকুলেশ দেবনাথ, তহমিনা খাতুন, প্রলয় কোনার, অভিজিৎ ঘোষ, কৌশিক বাগচি, জয়ন্ত ব্যানার্জী, মিতা ঘোষ, অপালা ভট্টাচার্য, শুভব্রত মণ্ডল।

24-পরগনা ঃ শুভঙ্কর চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ সরকার ধাড়া, দেবকুমার ঘোষ, শান্তনু মণ্ডল, অর্ণব কুমার সামন্ত, সৌমেন দত্ত, সৈকত চক্রবর্তী, সন্দীপ ঘোষাল, রুদ্র প্রসাদ হালদার, সুদীপ মজুমদার, রাতুল কুমার চন্দ্র রায়, সুরজিৎ কুমার ঘোষ, অনুপম দাস মাজী মানস মিশ্র, কমল কৃষ্ণ রায়, শৈবাল নন্দী, সৈকত সিংহ রায়, মলয় কুমার সরকার, জ্যোতিপ্রকাশ মণ্ডল, বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, তাপস কুমার ভট্টাচার্য, কল্লোল রায়, শুভব্রত মিত্র, সৌম্য চক্রবর্তী, পলাশ কুমার বড়াল, বাপী দাস, নিখিল চন্দ্র ভট্টাচার্য, পঙ্কজ কুমার সাউ, কুন্তল বসু, রাজকুমার চক্রবর্তী।

হাওড়া ঃ দীপক কুমার বাগ, সুব্রত আদক, সৌমিক নাথ, দেবব্রত ব্যানার্জী, দেবরাজ পাল, শুভাশিস চক্রবর্তী, পিয়ালী ব্যানার্জী, তাপস কুমার বেরা।

হুগলী ঃ অনিন্দ্য সরকার, অনুপম বসু সরকার, সুরজিৎ সিমলাই, বিজয় চট্টোপাধ্যায়, কল্লোল ভট্টাচার্য, দেবমালা যশ, কাকলি সরকার, অনিরুদ্ধ গুপ্ত, দেবাশিস গায়েন, প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন মণ্ডল।

বর্ধমান ঃ মোহনলাল চক্রবর্তী, ডি. পি. বিশ্বাস, সুপ্রিয় বসু, শিবাশিস সরকার, কঙ্কন দাস, দেবজ্যোতি পানি, অমিত দাস, সুমন্ত মুখার্জী, শুভেন্দু পাল, শোভন দত্ত, প্রসুন মিত্র, আশিস মণ্ডল, সুখেন্দু বিকাশ চৌধুরী, ব্রহ্মানন্দ রায়, কৃষ্ণেন্দু বিশ্বাস, মণিদীপা দাঁ, সুধাংশু ঘোষ, প্রীতিরঞ্জন সরকার, অনির্বাণ ব্যানার্জী, জয়ন্ত মণ্ডল, সেখ ফজলুর রহমান, পার্থপ্রতিম লাহা, ধৃতব্রত দাস, পিনাকী চক্রবর্তী, পিউ হাজরা, সন্দীপ পাল, জয়ন্ত মুখার্জী, জয়ন্ত তলাপাত্র, ইন্দ্রজিৎ মুখার্জী, সাগরময় গরাই, কাকলি আশ, অনুপম মজুমদার।

মেদিনীপুর ঃ শান্তনু দিন্দা, সুশান্ত হালদার পুলক গায়েন, চৈতালী কুন্ডু, বিপ্লব কুমার সাহু, অপরাজিতা দত্ত মজুমদার, শঙ্খ প্রতিম ভট্টাচার্য, অনিন্দ্য রায়, সুজন বন্ধু সামন্ত, অতীশ দাস, সেখ মতিউর রহমান, দিব্যেন্দু দে, শুভাশিস দে, কৃষ্ণেন্দু দে, অনুপ কুমার দাশ, মৌসুমী মাইতি, জয়েস মাইতি, পুলিন বিহারী সাউ, মধুমিতা সাহু, শান্তনু গুছাইত, অরুণ কুমার মণ্ডল, বিশ্বনাথ প্রামাণিক, উদয় শঙ্কর মহাপাত্র, শিপ্রা কর, সুশীল কুমার ভুঁইঞা।

বীরভূম ঃ মোহাঃ জামাল, অর্ণব ঘোষাল। **বাঁকুড়া ঃ** সুব্রত কুমার পাত্র, শুভাশিস মাইতি, হারাধন মাজী।

নদীয়া ঃ শিপ্রা পাল, শ্রীরাম সরকার, অনির্বাণ ঘোষ, শুভাশিস বিশ্বাস, মিলন চন্দ্র বিশ্বাস, টোটন সরকার, সোম শঙ্কর বিশ্বাস, অমলেশ বালা। **মুর্শিদাবাদ ঃ** কেয়া চৌধুরী, বর্ণালী রায়চক্রবর্তী, অরুপরতন মণ্ডল, মহঃ আখতারুজ্জমান, চঞ্চল অধিকারী, চিরঞ্জীব সরকার, ইন্দ্রজিৎ সাহা।

পঃ দিনাজপুর ঃ প্রবীর কুমার চৌধুরী, অভিজিৎ ব্যানার্জী, অপূর্ব কুমার পাল, কিশোর কুমার আগরওয়ালা, জয়দীপ দাশ। **মালদহ ঃ** সঞ্জীব রায়, অভিজিৎ কর্মকার সুবীর দেবনাথ।

কোচবিহার ঃ প্রলয় কান্তি ডাকুয়া। **উত্তর ত্রিপুরা ঃ** নীলাদ্রি নাথ।

জলপাইগুড়ি ঃ মৃত্যুঞ্জয় সিনহা, পল্লব কুমার রায়।

আসাম/শনিতপুর ঃ বাপ্পা ভট্টাচার্য। **সিংভূম/বিহার ঃ** সুপ্রিয় কুমার সাধু

আগস্ট '86-এ প্রকাশিত সিনিয়র ফটো ক্যুইজের সঠিক উত্তর কেউই দিতে পারেনি।

প্রশ্নোত্তর

কাঁথি, মেদিনীপুর থেকে সম্পদ দাস, জয়দেব দাস, মিলন মিশ্র, দ্বিজেন্দ্র মান্না, অর্ঘ্য বেরা, সন্দীপ দাস, মনোজিৎ দাস, প্রবীর জানা, বিশ্বজিৎ দাস, হলধর জানা, সুকুমার জানা, বিশ্বনাথ মাইতি, গোপাল কর, সম্পা বেরা, মধুমিতা দাস, তৃপ্তি পাণ্ডা, গীতা মাইতি, বিনীতা খাটুয়া, মৌসুমী জানা, মীরা বর্মণ, কবিতা দাস, সোনালী জানা, রাধা গিরি, ঝর্ণা সেন, সুতপা জানা, রীতা দত্ত, সোমা দাস, মহুয়া দাস, মামণি জানা, অনিন্দিতা গায়েন, অনিল জানা, অশোক দাস, অনাদি দাস, গোপাল মাইতি, সোমনাথ ওঝা, হিরক জানা, অমল বেরা, অপু আদক, তন্ময় দাস ও অভিজিৎ দাস, তোমরা একই চিঠিতে চল্লিশ জনে চল্লিশটি প্রশ্ন পাঠিয়েছো। তোমাদের সব প্রশ্ন না হলেও বেশ কিছু প্রশ্ন কিশোর জ্ঞান-বিজ্ঞানের পক্ষে উপযোগী। তবে সেগুলির সবকটির উত্তর একই সংখ্যায় দেওয়া সম্ভব নয়। নিয়মিতভাবে কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান পড়লেই প্রশ্নগুলির উত্তর জানতে পারবে। তাছাড়া গত জুলাই সংখ্যায় পেয়ে গেছো 'আত্মা' ও 'প্ল্যানচেট' সম্বন্ধে উত্তর, পৃথিবী সৃষ্টি সম্বন্ধে মতবাদ পেয়েছো আগস্ট সংখ্যায়। সিগারেটের অপকারিতা, পৃথিবীর বাইরে বুদ্ধিমান জীব আছে কিনা, প্রশ্নগুলির জন্য পূর্ববর্তী সংখ্যাগুলি খোঁজ কর। বর্তমানে তোমাদের একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হল।

প্রঃ—মানুষের আত্মহত্যার পেছনে কি কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে?

উঃ—আছে। কোন কারণে মনের উপর গভীর চাপ সৃষ্টি হলে মস্তিষ্ক যেন দিশেহারা হয়ে উঠে। এই অবস্থায় এক ধরনের হর্মোন নির্গত হয়। সেই হর্মোনই আত্মহত্যায় প্ররোচিত করে এবং সুস্থ চিন্তাশক্তিকে ব্যাহত করে।

ব্যাপারটা সবার জানা থাকলে অর্থাৎ হার্মোনেরই ক্রিয়া মনে করলে অনেক অঘটন ঘটতে পারতো না। আর অনুরূপ মনোভাব কালেই হার্মোন নিঃসরণ বন্ধ হয় এবং আত্মহত্যার প্রবণতাও লুপ্ত হয়ে যায়। একেবারে ক্ষণস্থায়ী ব্যাপার যেন। অপ্রাসঙ্গিক হলেও মহর্ষি জরথুশ্ত্রের একটি বাণী উদ্ধৃত করলাম—'প্রাকৃতিক দুর্যোগ যত ভয়ঙ্কর হোক না কেন বেশিক্ষণ স্থায়ী হতে পারে না। তেমনই মানুষের বিপদ যেমন তাড়াতাড়ি আসে তেমন তাড়াতাড়ি বিদায়ও নেই। তাই দিশেহারা হয়ে পড়তে নেই।'

প্রঃ—মঙ্গলগ্রহ মানুষের বাসযোগ্য নয় কেন? ভবিষ্যতে মানুষ কি তাকে বাসযোগ্য করে তুলতে পারবে? পুলিনবিহারী সাউ, ইন্দা কৃষ্ণলাল শিক্ষায়তন খড়্গপুর।

উঃ—পার্থিব পরিবেশে অভ্যস্ত মানুষের মঙ্গল গ্রহে টিকে থাকা অসম্ভব। মঙ্গলের অভিকর্ষীয় টান পৃথিবীর 0 38 অংশের মত। এখানকার আবহমণ্ডলে নাইট্রোজেন ও কারবন ডাই অক্সাইডের প্রাচুর্য কিন্তু অক্সিজেনের পরিমাণ নিতান্তই কম। তাছাড়া মঙ্গলের চৌম্বকক্ষেত্র অত্যন্ত দুর্বল বলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলি ও উল্কারা অহরহ নেমে আসছে মঙ্গল পৃষ্ঠে। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অতি সামান্যই। অতএব সবদিক থেকে বিবেচনা করলে উষর মঙ্গলপৃষ্ঠকে মনুষ্যবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী বলা যায়।

তবে আশ্চর্যের কথা, মঙ্গলের অভিকর্ষীয় টান খুব কম হলেও এবং প্রস্থানবেগ সেকেণ্ডে মাত্র 3·2 মাইল হলেও হালকা একটা আবহমণ্ডল আছে। তাতে অল্প স্বল্প জলীয় বাষ্প এবং অক্সিজেনও আছে। অতীতে নাকি মঙ্গলের আবহমণ্ডলে প্রচুর অক্সিজেন ছিল বর্তমানে মঙ্গল পৃষ্ঠের লৌহশিলার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে ঘটাতে প্রায় নিঃশেষ হয়ে এসেছে। জলীয় বাষ্পও ছিল আশানুরূপ। বিজ্ঞানের অভিধানে অসম্ভব বলে কিছু নেই। ভবিষ্যতের উন্নত বিজ্ঞান মঙ্গলপৃষ্ঠের উপাদানগুলি থেকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন আবহমণ্ডলে পাঠিয়ে বাসোপযোগী করে তুলতেও পারে।

এখন আবার কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন, মঙ্গলপৃষ্ঠে বর্তমানে হানা দিয়েছে তুষার যুগ। অতএব তার আবহমণ্ডলের বহু পদার্থ তুষারে পরিণত হয়েছে। অক্সিজেন ও জলীয়বাষ্প লাভ করা অসম্ভব হবে না।

প্রঃ আন্ত্রিক রোগের লক্ষণ ও প্রাথমিক চিকিৎসা কি? (1) আশিসকুমার সাউ—এগরা, মেদিনীপুর; (2) অমলেশ বালা ও অমিত রে, বগুলা উচ্চ বিদ্যালয়, নদীয়া।

উঃ—আন্ত্রিক রোগটা পৌষ্টিকনালী ঘটিত রোগ। কলেরা, আমাশা, উদরাময় প্রভৃতও আন্ত্রিক রোগের পর্যায়ে পড়ে। তবে সবচেয়ে মারাত্মক কলেরা ও রক্ত আমাশা। কলেরায় পাতলা দাস্ত ও বমি হয় এবং শিগেলা নামক এক রকমের জীবাণু ঘটিত রোগ রক্ত আমাশায় দাস্তের সঙ্গে রক্ত পড়ে। ফলে শরীরের মধ্যে অল্প সময়ে প্রয়োজনীয় জলের ঘাটতি ঘটে। তাছাড়া দাস্তের সঙ্গে শরীর থেকে বেরিয়ে যায় শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় কয়েকটি ধাতব লবনও। শিশুদের পক্ষে অতীব মারাত্মক এ অসুখ। চিকিৎসা সত্ত্বেও দু-তিন সপ্তাহ পর্যন্ত ভোগায়।

এই রোগে আক্রান্ত হলে প্রাথমিক অবস্থাতেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। শরীরের জল দাস্ত ও বমির সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়ায় রক্ত জমাট বেঁধে মৃত্যু ডেকে আনে।

—সুধাংশু পাত্র

গাদিয়ারা

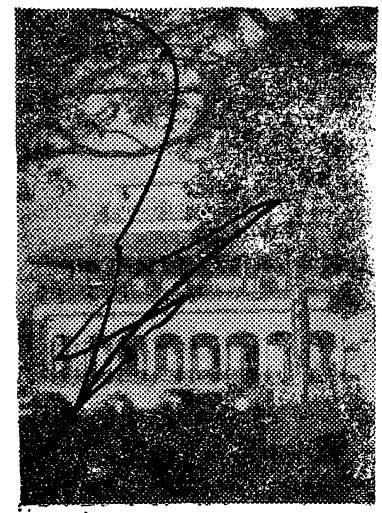

কলকাতার কাছেই গাদিয়ারা। শান্ত, নির্জন। হুগলী আর রূপনারায়ণ মিলেছে এখানে।

গাদিয়ারার ট্যুরিস্ট লজে রয়েছে ৩টি দুইশয্যার ঘর আর একটি ৬ জনের ডর্মিটরী। থাকার ফুরসৎ না পেলে বেড়াতে আসুন পিক্‌নিকে। রাঁধাবাড়ার সরঞ্জাম মিলবে।

কলকাতা থেকে মাত্রই ৭৯ কিলোমিটার। বাগনান পর্য্যন্ত আসুন ট্রেনে। তারপর বাসে শ্যামপুর হয়ে শিবপুর।

বিশদ বিবরণ ও বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করুন—

ট্যুরিস্ট ব্যুরো

৩/২ বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ (পূর্ব)
কলিকাতা-৭০০ ০০১, ফোন-২৩-৮২৭১
গ্রাম-ট্রাভেলটিপস

পর্যটন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার